দাওয়াত ও তাবলীগের ছয় উসূল: কূপের ভেতর মহাসাগর

শাইখুল হাদীস আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.

বাংলাদেশে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের সংকটময় পরিস্থিতিতে যে সকল উলামায়ে কেরাম নববী মেহনতের হেফাজতের লক্ষ্যে দরদী অভিভাবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন এবং দ্বিধাবিভক্ত উম্মতকে রাহবারী করেছেন, তাঁদের অন্যতম হচ্ছেন বিশিষ্ট দাঈ ইলাল্লাহ শাইখুল হাদীস আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.। গত ১৯/১১/২০২০ ঈসায়ী, বৃহস্পতিবার, বাদ মাগরিব হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. ঢাকার মুহাম্মদপুর শবগুযারী পয়েন্টে ঈমান-আমলের মেহনত সর্ম্পকে তাবলীগের ছয় উসূলের উপর বিশ্লেষণমূলক বয়ান পেশ করেন। বয়ানটি আওয়াম-খাওয়াছ সকলের জন্য পাথেয় বিবেচনায় পাঠকের খেদমতে উপস্থাপন করা হলো– সম্পাদক।

হামদ ও সালাতের পর হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. কুরআনে কারীমের নিম্নলিখিত আয়াত ও হাদীস তিলাওয়াত করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا.

(অর্থ:) হে মুমিনগণ! ঈমান রাখো আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি, যে কিতাব তাঁর রাসূলের প্রতি নাযিল করেছেন তার প্রতি এবং যে কিতাব তার আগে নাযিল করেছেন তার প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাগণকে, তাঁর কিতাবসমূহকে, তাঁর রাসূলগণকে এবং আখিরাতকে অস্বীকার করে, সে সঠিক পথ থেকে সরে গিয়ে বহু দূরে নিপতিত হয়। (সূরা নিসা-১৩৬)

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.

(অর্থ:) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বিদায় হজ্জের খুৎবায়) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের উপস্থিত ব্যক্তি যেন (আমার আনীত দীন) অনুপস্থিত ব্যক্তিকে পৌঁছে দেয়। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৭০৭৮)

অতঃপর হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. বলেন–

মুহতারাম দোস্তো বুযুর্গো!

আল্লাহ পাক আমাদেরকে যে হায়াত দান করেছেন, তার এক-একটি মুহূর্ত অত্যন্ত দামী। হায়াতের এই মহাদৌলত এতোটাই দামী যে, জান্নাতীরা জান্নাতে গিয়েও দুনিয়ায় যে মুহূর্তটি বিনা আমলে নষ্ট করেছে তার জন্য আফসোস করবে। এমনিভাবে মানুষের মেহনতও অনেক দামী। এতো দামী যে, যার পেছনে এই মেহনত করা হয় সেটাও দামী হয়ে যায়। দশ টাকার এক টুকরো সামান্য প্লাস্টিকের পেছনে মেহনত করে যখন খেলনা গাড়ী বানানো হয় তখন তা হাজার টাকায় বিক্রি হয়। অনুরূপ দুই মুঠো মাটির তেমন মূল্য নেই, কিন্তু এর পেছনে মেহনত করে যখন হাড়ি-পাতিল বানানো হয় তখন তা মূল্যবান সামগ্রী হয়ে ওঠে। মোটকথা, যার পেছনেই মানুষের মেহনত লাগে তা দামী হয়ে যায়। আজ মানুষের অধিকাংশ মেহনত চীজ ও আসবাবের উপরে লাগছে এজন্য দুনিয়াতে চীজ ও আসবাবের দাম বেড়ে গেছে। মানুষেরই মেহনতের ফলে আজ দুনিয়া চিত্তাকর্ষক ও চাকচিক্যময়। কিন্তু আফসোস, মানুষের এই যে হরদম মেহনত ও উদয়াস্ত পরিশ্রম, তা তার নিজের উপর লাগছে না। নিজের উপর যে মেহনত করতে হয়, তা-ই যেন মানুষ জানে না। মানুষ যদি নিজের উপর মেহনত করতো তাহলে সে দামী হতে হতে ফেরেশতাদেরও উর্ধ্বে উঠে যেতো। হাদীসে এসেছে, বান্দা যখন কুরআন তিলাওয়াত করে তখন তার তিলাওয়াত শোনার জন্য ফেরেশতারা জড়ো হয়ে যায়। জুমু'আর দিন খুৎবার আগ পর্যন্ত ফেরেশতারা আগত মুসল্লীদের জন্য সাওয়াব লিখতে থাকে। কিন্তু যখন খুৎবা শুরু হয়ে যায় তখন ফেরেশতারা বান্দার খুৎবা শোনার জন্য লেখা বন্ধ করে দেয়। আমাদের বাবা সায়্যিদুনা হযরত আদম আলাহিস সালামকে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের সামনে সম্মান দিয়েছেন; তাদেরকে হুকুম করেছেন হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করার জন্য। আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা মানুষকে তাদের দাম ও মূল্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এখন মানুষকে এই দাম পেতে হলে তার নিজের উপর মেহনত করতে হবে। ভয়ের কিছু নেই, নিজের উপর মেহনত করার জন্য কামাই-রোজগার, ব্যবসা-বাণিজ্য কিছুই ছেড়ে দিতে হবে না; বরং আমরা নিজেদেরকে দামী ও মূল্যবান বানানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহর দীনের জন্য মেহনত করবো, পাশাপাশি জীবিকার জন্যও হালাল উপায় অবলম্বন করবো। সেইসাথে এই একীনও রাখতে হবে যে, আমি কামাই-রোজগারের পেছনে চব্বিশ ঘণ্টা মেহনত করলে যে ফল পাবো, তার চেয়ে কম সময় মেহনত করলেও তা-ই পাবো। কারণ রিযিকের ফায়সালা হয়ে গেছে এবং যতোটুকুর ফায়সালা হয়েছে– সময় যতোই বেশি দেই না কেন– তার থেকে একদানাও বাড়বে না, একদানাও কমবে না। এমনকি কেউ যদি হারাম পন্থাও অবলম্বন করে এতেও তার রিযিক বাড়বে না; যতোটুকু লিখিত আছে ততোটুকুই পাবে। এজন্য প্রকৃত জ্ঞানী লোকেরা রিযিকের জন্য খুব বেশি সময় দেন না, নামকাওয়াস্তে কিছু সময় দেন। তারা হায়াতের এই মূল্যবান পুঁজিকে দীনের মেহনতের জন্য ব্যয় করেন। এর ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে চমকে দেন। হতে পারে সে রিকশাওয়ালা কিন্তু তার বয়ান শোনার জন্য গোটা মহল্লাবাসী প্রতীক্ষায় থাকে, তার মুখের কথায় আল্লাহ পাক অনেক মানুষের হেদায়াতের ফায়সালা করে দেন। উদাহরণত হযরত বেলাল হাবশী রাযি. গোলাম ছিলেন, কুচকুচে কালো ছিলেন। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা অনুযায়ী মেহনত করেছিলেন। ঈমানের উপর অটল ও অবিচল ছিলেন। ফলে তিনি পুরো উম্মতের মান্যবর হয়ে গেছেন। সাহাবী নন এমন লক্ষ-কোটি আল্লাহর ওলীও হযরত বেলাল রাযি.-এর ঈমান ও ঈমানী মেহনতের উপর কুরবান হতে প্রস্তুত আছেন।

মুহতারাম দোস্তো বুযুর্গো!

এখন আমি আমার ঐ সকল ভাই যারা বলেন– 'আমরা আলেমদের সাথে আছি, আমাদের রাহবার ও মুরুব্বী হলেন উলামায়ে কেরাম'– তাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা আরয করতে চাই। কথাগুলো হলো– এই যে আমরা দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতকারীগণ 'ছয় উসূল' নিয়ে আলোচনা করি, যেটাকে 'ছয় নম্বর'-ও বলা হয়, হযরতজী ইলিয়াস রহ.

অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই ছয় উসূলের মাধ্যমে দীনের সারসংক্ষেপ তুলে ধরেছেন। এখন এই ছয় উসূলের ভেতর কিভাবে দীনে ইসলামের সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছে, তা আমাদেরকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানতে হবে। ব্যাখ্যা ছাড়া ছয় উসূল তো নিছক একটি কূপ! অথচ ছয় উসূল হলো এমন এক কূপ যার মধ্যে মহাসাগরকে ভরে দেয়া হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে আমিও এর সবিস্তার ব্যাখ্যায় যাবো না; শুধু ইঙ্গিত দিয়ে চলে যাবো। আপনারা নিজ নিজ সময়-সুযোগ অনুযায়ী উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে পুরোটা জেনে নিবেন।

প্রথম উসূল: কালিমা তথা ঈমান সহীহ করা

মুহতারাম দোস্তো বুযুর্গো!

আমি যে আয়াতটি তিলাওয়াত করেছি তাতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন– (অর্থ:) হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি...। (সূরা নিসা-১৩৬)

এ আয়াতে আল্লাহ পাক ঈমানদারদেরকে ঈমান আনতে বলেছেন। অথচ ঈমানদারদের তো আগে থেকেই ঈমান বিদ্যমান আছে, তাহলে নতুন করে ঈমান আনার অর্থ কী? এর অর্থ হলো, ঈমানকে এমন মজবুত করো যে, পাহাড় টলতে পারে কিন্তু ঈমান টলবে না। ঈমানের এই রকম মজবুতি হাসিল হবে নিয়মিত মেহনত করার দ্বারা। হযরত সাহাবায়ে কেরাম বলতেন, আমাদের সামনে যদি জান্নাত-জাহান্নাম এনে উপস্থিত করা হয় তবুও আমাদের ঈমান আর বাড়বে না। কারণ, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিয়ে এমন মেহনত করিয়েছেন যে, আল্লাহ পাক আমাদেরকে মুকাম্মাল ঈমান দান করেছেন। এখন চোখে দেখলে যে বিশ্বাস হবে, না দেখেই আমাদের সে বিশ্বাস অর্জিত হয়ে গেছে। সুবাহানাল্লাহ! কিন্তু আমরা কি এমনটা বলতে পারবো? এজন্য আমাদেরকে আরও বেশি বেশি মেহনত করতে হবে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা বারবার ঈমানদারদেরকে ঈমান আনতে বলেছেন। এর দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন, তোমরা ঈমানের উপর মজবুত মেহনত করো। কেননা, ঈমানের উপর চতুর্দিক থেকে শয়তানের হামলা হবে। এই হামলায় তুমি যাতে তোমার ঈমানকে রক্ষা করতে পারো এর জন্য মজবুত ঈমান দরকার। নড়বড়ে ঈমান হলে তো মাত্র দশটাকায় বিক্রি হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ একটু মিথ্যা বললেই দশটাকা লাভ হবে। তো তুমি মিথ্যা বলাকে প্রাধান্য দিয়ে ঈমানকে বিক্রি করে দিবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এ রকম নড়বড়ে ঈমানের উপর রাখতে চান না। তিনি চান আমাদের ঈমান যেন এমন পাকাপোক্ত হয়, যা পুরো দুনিয়ার বিনিময়েও বিক্রি হবে না। কারণ, একজন সত্যিকার মুমিনের কাছে দুনিয়া এবং দুনিয়ার যাবতীয় ধন-সম্পদও 'কালীল'- অল্প ও অতি তুচ্ছ। এজন্য এ আয়াতটি আমরা সর্বদা সামনে রাখি এবং ঈমান মজবুত করার মেহনত অব্যাহত রাখি।

মুহতারাম দোস্তো, বুযুর্গো!

ঈমানের উপর মেহনত করার দু'টি বিশেষ দিক রয়েছে–

(ক) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত প্রতি ফরয নামাযের পর এই দু'আ পড়তেন–

اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

(অর্থ:) হে আল্লাহ! আপনি যা দান করেন তার কোন রোধকারী নেই আর আপনি যা রোধ করেন তার কোন দানকারী নেই এবং (কিয়ামতের দিন) আপনার (শাস্তির) মোকাবেলায় কোন অভিজাতের আভিজাত্য উপকারে আসবে না।

অর্থাৎ বান্দাকে কোন কিছু দেয়া বা না দেয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা কোন মাখলুকের মুহতাজ ও মুখাপেক্ষী নন; বরং সমস্ত মাখলুক নিজেদের সকল প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার মুহতাজ ও মুখাপেক্ষী। সুতরাং আমাদের অন্তরে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করে নিতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলার হুকুম ছাড়া কেউ আমার উপকার-অপকার কিছুই করতে পারবে না। কেউ কিছু করতে চাইলে সেখানে আল্লাহ তা'আলার হুকুমের প্রয়োজন হবে অর্থাৎ সেটা আমার তাকদীরে লেখা থাকতে হবে এবং যতোটুকু লেখা আছে ততোটুকুই ঘটবে। তো দাওয়াত ও তাবলীগের মুবারক মেহনতে কালিমার উসূল রাখার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, দিল থেকে মাখলুকের ইয়াকীন দূর করা এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি ইয়াকীন জমানো।

(খ) আমানতু বিল্লাহি ওয়া-মালাইকাতিহী... অর্থাৎ ঈমানে মুফাসসালের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ঈমানের যে সাতটি শিরোনাম বিবৃত হয়েছে যথা: আল্লাহর উপর, ফেরেশতাদের উপর, কিতাবসমূহের উপর, রাসূলগণের উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ভালো-মন্দ তাকদীরের উপর এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়ার উপর ঈমান আনা– এগুলো ব্যাখ্যাসহ জানা এবং ইয়াকীন করা। এই সাতটি শিরোনামের বিস্তারিত বিবরণ বেশ দীর্ঘ। তাবলীগের সফরে সাধারণত এগুলোর বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ হয়ে উঠে না। এজন্য আমরা উলামায়ে কেরাম থেকে এগুলো জেনে জেনে ইয়াকীন অর্জন করবো।

দ্বিতীয় উসূল: নামায

ইবাদতসমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো নামায। কুরআনে কারীমের এক আয়াতে নামাযকে ঈমান বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ (অর্থ:) আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ঈমানকে নষ্ট করবেন না। এটি সূরা বাকারার ১৪৩ নম্বর আয়াতের অংশবিশেষ। তাফসীর সম্পর্কে ধারণা রাখে এমন যে কোন আলেমকে জিজ্ঞেস করুন– এখানে 'ঈমান' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? উত্তর পাবেন, এখানে ঈমান শব্দটি নামায অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হিজরতের পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘদিন বাইতুল মাকদিসের দিকে ফিরে নামায পড়তেন। পরে আল্লাহ তা'আলা কিবলা পরিবর্তন করে বাইতুল্লাহর দিকে করে দিলেন। তখন কোন কোন সাহাবীর মনে প্রশ্ন জাগল, আমাদের যে সকল মুসলিম ভাই পুরনো কেবলার দিকে ফিরে নামায আদায় করে মৃত্যুবরণ করেছেন, নতুন কিবলা পাননি তাদের অবস্থা কী হবে? আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করে জানিয়ে দিলেন, সবদিকই আমার কেবলা; আগেরটিও আমার আদেশে হয়েছিল, পরেরটিও আমারই আদেশে হয়েছে। সুতরাং আমি বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ করে আদায়কৃত তোমাদের পূর্ববর্তী ঈমান অর্থাৎ নামাযগুলো নষ্ট করবো না। সারকথা, আয়াতে কারীমায় নামাযকে ঈমান শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর দ্বারা সহজেই নামাযের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুধাবন করা যায়।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে মানুষের আকৃতিতে পাঠিয়ে দুই দিনে দশ ওয়াক্ত নামায নবীজীকে হাতেকলমে শিক্ষা দিয়েছেন। সহীহ হাদীসের কিতাবগুলো এ সম্পর্কিত বর্ণনায় ভরপুর। এর দ্বারা একদিকে যেমন নামাযের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়, অপরদিকে নামায যে কারো কাছে হাতেকলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিখতে হয়, একা একা হয় না এটাও ভালোভাবে বোঝা যায়।

মুহতারাম দোস্তো বুযুর্গো!

আমাদের কিন্তু এই প্রশিক্ষণের বড় অভাব রয়েছে। শুধু অভাব বলি কেন উদাসীনতাও রয়েছে। আমরা কি সুন্নাত তরীকায় নামাযে পারদর্শী কোন আলেমকে নিজের নামায দেখিয়েছি যে, হুযূর! দেখুন তো আমার রুকুটা হচ্ছে কিনা, সিজদাটা হচ্ছে কিনা, হাত তোলাটা ঠিকমতো হচ্ছে কিনা? বেশিরভাগই দেখাইনি। আমরা বরং অন্যের দেখাদেখি নামায পড়ি। অথচ নামাযের মতো এতো বড় আমল অন্যের দেখাদেখি করার জিনিস নয়; শিখাশিখির মাধ্যমে অর্জনের জিনিস। এজন্য আমাদেরকে বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নামায শিখতে হবে এবং মেহনত করে করে নামাযের ভেতর-বাহির রাসূলের নামাযের মতো বানানোর চেষ্টা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَنْ صَلَّي صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ

(অর্থ:) যে ব্যক্তি আমার নামাযের মতো নামায পড়বে এবং আমার কিবলা অনুসরণ করবে সে-ই প্রকৃত মুসলিম, তার নিরাপত্তার দায়িত্ব আল্লাহ ও তার রাসূলের। সুতরাং তোমরা আল্লাহর নিরাপত্তা বিনষ্ট করো না। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৯১)

এই যে হাদীসে বলা হলো, مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا অর্থাৎ 'আমার নামাযের মতো নামায পড়বে'– এটা বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে না শিখলে কখনও সম্ভব হবে না। এজন্য আমরা আমাদের নামায উলামায়ে কেরামকে দেখিয়ে শিখে নেবো, সংশোধন করে নেবো। সেইসাথে সূরা-কিরাআত সহীহ করবো এবং নামাযের মাসআলা-মাসাইল শিখে নেবো।

তৃতীয় উসূল: (ক) ইলম

কোন্ আমল করলে কী লাভ হবে, কোন্ ক্ষতি থেকে বাঁচা যাবে, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমলকারীকে কী পুরস্কার দিবেন এবং কোন শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন– এগুলো জানাকে ফাযাইলের ইলম বলা হয়। আরেকটা হলো, কোনো আমল বাস্তবায়ন করার পদ্ধতি কী, কিভাবে করা হলে সেটা আমল বলে গণ্য হবে, পরিপূর্ণ সাওয়াব পাওয়া যাবে? এবং আমলটির বিভিন্ন অংশের মান কী– ফরয, ওয়াজিব, নফল নাকি মুস্তাহাব? এগুলো জানাকে মাসাইলের ইলম বলা হয়। আমরা যারা দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের সঙ্গে জড়িত আছি, তারা ফাযাইলের ইলম তো তালীমের হালকা থেকে শিখতে পারছি। কিন্তু মাসাইলের ইলম? এটা সরাসরি উলামায়ে কেরামের সোহবত থেকে শেখার বিকল্প নেই। মনে রাখতে হবে, ফাযাইলের ইলম আমলের প্রতি শওক ও আগ্রহ সৃষ্টি করে আর মাসাইলের ইলম আমলকে আমলে পরিণত করে, কবুলযোগ্য বানিয়ে দেয়। অনুরূপভাবে ফাযাইল, মাসাইল দু'টোই উপকারী ইলম কিন্তু মাসাইলের ইলম অতিশয় জরুরী। কেননা মাসাইলের ইলমের একটা অংশ হলো ফরযে আইন; যেটি মুসলমানমাত্রই অর্জন করা ফরয। যেমন: (১) ঈমানকে শিরকমুক্ত করা। (২) উযূ-গোসল, নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাতসহ সমস্ত ইবাদত বন্দেগী হুবহু নবীর তরীকায় আদায় করা। (৩) চাকরী-বাকরী হালাল হওয়া, লেনদন হারাম না হওয়া। (৪) মানুষ হিসেবে আমার সঙ্গে যতো মানুষের সংশ্লিষ্টতা আছে, যেমন পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, স্বধর্মী-বিধর্মী এমনকি অবোধ প্রাণী– এদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমার আচরণ কেমন হবে এবং আমার কাছে তাদের প্রাপ্য ও অধিকার কী তা জেনে নেয়া। (৫) অন্তরের কিছু রোগ আছে সেগুলো দূর করা। যেমন: অহংকার, লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, ক্রোধ, আত্মতুষ্টি, রিয়া তথা লোকদেখানো প্রবণতা, দুনিয়ার প্রতি আসক্তি ইত্যাদি। অনুরূপভাবে অন্তরের কিছু গুণ আছে সেগুলো অর্জন করা। যেমন: ইখলাস, বিনয়, তাওবা, ছবর, শোকর, আখেরাতের স্মরণ, আল্লাহর মহব্বত ইত্যাদি।

এই পাঁচটি বিষয়ের ইলম অর্জন করা ফরযে আইন। সবার জন্য মুফতী হওয়া, আলেম হওয়া জরুরী নয় বরং ফরযে কেফায়া; কিন্তু এই পাঁচটি বিষয়ের ইলম অর্জন করা সবার জন্য ফরযে আইন। হাশরের ময়দানে আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন, ফরযে আইন পরিমাণ ইলম শিখেছিলে কিনা? এর জবাব না দিয়ে কেউ পার পাবে না। এজন্য ফাযাইলের ইলম তো আমরা শিখবোই কিন্তু তার চেয়ে বেশি গুরুত্বসহকারে সহীহ তরীকায় অর্জন করবো মাসাইলের ইলম। অনুরূপভাবে প্রতিটি মসজিদ ও মাদরাসায় জনসাধারণের জন্য উল্লিখিত পাঁচটি বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকা জরুরী। এর জন্যও আমরা ফিকির রাখবো।

তৃতীয় উসূল: (খ) যিকির

যিকির কথাটা অনেক ব্যাপক। এই যে আমরা দীনের আলোচনা করছি, এটাও যিকির। তাসবীহ-তাহলীল তথা সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ বলাও যিকির। আর সর্বোত্তম যিকির হলো কুরআন তিলাওয়াত। এজন্য আমরা সকলে কুরআন তিলাওয়াত বিশুদ্ধ করে নিই। এখন আলহামদুলিল্লাহ! বিভিন্ন মসজিদে বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শেখার ব্যবস্থা আছে, এটাকে গনীমত মনে করি। আমরা আল্লাহর পক্ষ হতে মাত্র একখানা কিতাব– কুরআন মাজীদ উপহার পেয়েছি এটাকেই যদি সহীহ করে পড়তে না পারলাম, তাহলে আমরা কেমন মুসলমান হলাম!? চাল ছাড়া যেমন ভাত হয় না, কুরআন ছাড়াও তেমন মুসলমান হয় না। কুরআন তিলাওয়াত ছাড়াও আরও বিভিন্ন প্রকার যিকির আছে, আমরা নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী সেগুলোও বেশি বেশি করবো ইনশাআল্লাহ। আর উলামায়ে কেরামের বয়ান এটাও এক যবরদস্ত যিকির, এটাও শুনবো।

চতুর্থ উসূল: ইকরামুল মুসলিমীন

ইকরামুল মুসলিমীনের শাব্দিক অর্থ মুসলমানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। এর মর্ম হলো, আমি নিজের অধিকারকে পিছনে রেখে অন্যের অধিকারকে অগ্রাধিকার দেবো। অল্পকথায় এই সম্মান প্রদর্শন ও অগ্রাধিকার প্রদানের পদ্ধতি হলো– (ক) মুআমালাত তথা চাকরী-বাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ মানুষের সঙ্গে কৃত সকল লেনদেন শরীয়তসম্মত পন্থায় করা। অনুরূপভাবে হারামপন্থা, ধোঁকা, প্রতারণা, ফাঁকিবাজি, জালিয়াতি ইত্যাদির আশ্রয় না নেয়া। (খ) মুআশারাত তথা মুসলমানসহ সকল সৃষ্টিজগতের হক ও অধিকার আদায় করে দেয়া এবং তাদের সঙ্গে আচার-আচরণ দুরস্ত করে নেয়া; কারও অধিকার ক্ষুণ্ন ও খর্ব না করা।

পঞ্চম উসূল: তাসহীহে নিয়্যাত

অন্তরের অর্জনীয় ভালো দশগুণের একটি হলো তাসহীহে নিয়্যাত অর্থাৎ নিয়ত বিশুদ্ধ করা। এর সঙ্গে আরও নয়টি গুণ আছে এবং বিপরীত দিকে দশটা দোষ আছে, যার একটিই দোযখে নিয়ে যেতে পারে। জাহান্নাম যাদের দ্বারা উদ্বোধন করা হবে, তাদের মধ্যে মাত্র একটা দোষ থাকবে, রিয়া। কথা হলো, এই তাসহীহে নিয়্যাত দ্বারা শুধু একটি গুণ উদ্দেশ্য নয় বরং অন্তরের যে দশটি গুণ আছে তার সবগুলোও অর্জন করা এবং যে দশটি দোষ আছে তার সবগুলো বর্জন করা। এজন্য আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করবো, ইমাম গাযালী রহ.-এর তাবলীগে দীন নামে একটি কিতাব আছে, সেটি

আপনারা সংগ্রহে রাখবেন; তাহলে এ জিনিসগুলো বোঝা সহজ হয়ে যাবে। আর নিজের আত্মিক সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য কোন আল্লাহওয়ালা বুযুর্গের সাহায্য নিবেন।

তো এই যে দশ-দশ বিশটি বিপরীতমুখী গুণ এর সবগুলোই তাসহীহে নিয়্যাতের অন্তর্ভুক্ত। আমরা মুবাল্লিগ ভাইয়েরা বয়ানের মধ্যে শুধু তাসহীহে নিয়্যাতের কথা শোনাচ্ছি। এটা তো শিরোনাম; এর ভেতরে যে আরও ১৯টি গুণ রয়েছে তা জানাচ্ছি না। এগুলোও জানানো দরকার এবং মেহনত করে করে অর্জন-বর্জন করা দরকার।

ষষ্ঠ উসূল: খুরুজ ফী সাবীলিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া।

এর মৌলিক উদ্দেশ্য দু'টি– (ক) সাল, তিনচিল্লা, চিল্লা, তিনদিন, চব্বিশঘণ্টা ইত্যাদি সময়ের জন্য আমরা যখন বিভিন্ন এলাকায় সফর করবো তখন ঐ সব এলাকা বা মহল্লায় অনেক হক্কানী আলেমকে পাবো। সফরকালীন এসব হক্কানী আলেমের কাছ থেকে আমরা কিছু না কিছু অবশ্যই শিখবো। এক-এক আলেমের কাছে আল্লাহ তা'আলা এক-এক ধরনের দৌলত আমানত রেখেছেন। তাদের সোহবতে গিয়ে আমরা সেগুলো হাসিল করবো। (খ) বিদায় হজ্জের সময় আল্লাহর নবী আলাইহিস সালাম আমাদেরকে যে যিম্মাদারী ও দায়িত্ব প্রদান করেছেন যে, আমার আনীত দীন দুনিয়াবাসীর নিকট পৌঁছে দিবে সেই যিম্মাদারী আদায় করা।

মুহতারাম দোস্তো বুযুর্গো!

খুৎবার শুরুতে আমি এ বিষয়ক একটি হাদীস শরীফ পাঠ করেছি এটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের খুৎবায় বলেছিলেন–

فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.

(অর্থ:) আজ যে এখানে উপস্থিত সে যেন অনুপস্থিতদের কাছে আমার বাণী পৌঁছে দেয়। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৭০৭৮)

এ সময় নবীজীর সামনে হাজার হাজার সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তিনি উল্লিখিত কথাটি আলেম সাহাবীদেরকে নির্দিষ্ট করে বলেননি বরং সবাইকে লক্ষ্য করেই বলেছিলেন যে, তোমরা আমার কাছ থেকে এ যাবৎকাল দীন ও ইসলামের যতো কথা ও বিধিবিধান শুনেছো, জেনেছো সেগুলো যারা এখনো শোনেনি, জানেনি তাদের কাছে পৌঁছে দাও। এখানে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সকল উম্মতকে এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন; আলেম-গায়রে আলেমে পার্থক্য করেননি। আর সাহাবায়ে কেরাম তো ছিলেন আশেকে নবী! নবীজীর এক-একটি ইশারা-ইঙ্গিতের উপর জান কুরবানকারী। তারা এই সুমহান দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করার জন্য নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন। কোথায় আফ্রিকা, কোথায় চীন, কোথায় রাশিয়া, কোথায় আজারবাইজান আর আর্মেনিয়া– দুনিয়ার আনাচে-কানাচে আজ সাহাবায়ে কেরামের কবর বিদ্যমান। সাহাবায়ে কেরামের এই যে জীবনব্যাপি দুনিয়া সফর এটা কি নিছক দেশভ্রমণ আর চিত্তবিনোদনের জন্য ছিল? না, কস্মিনকালেও নয়; তারা তো ছিলেন আখেরাতের সন্তান। দীনের পয়গাম সারা দুনিয়ায় পৌঁছে দিয়ে নিজের আখেরাত সাজানোর জন্যই ছিল তাদের সমস্ত দৌড়-ঝাঁপ। অথচ তারা সবাই যে সম্পদশালী ছিলেন এমন নয়। দুনিয়াব্যাপি সফরের জন্য যে পরিমাণ সম্পদ দরকার তা তাদের সকলের হাতে ছিল না। সাহাবায়ে কেরামের ম্যধ্যে হাতেগোণা দু'-চারজনই ধনী ছিলেন। মক্কায় হযরত আব্বাস, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, উসমান ইবনে আফফান আর মদীনায় হযরত রাফে ইবনে খাদীজ রাযিয়াল্লাহু আনহুম– এরকম মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাহাবী ধনী ছিলেন। এরা ছাড়া অন্য সবাই তো 'দিন আনে দিন খায়' পর্যায়ের ছিলেন। এমন গরীবী হালতেও সাহাবায়ে কেরাম কিছু কিছু সম্পদ বাঁচিয়ে রাখতেন। তারা সম্পদ বাঁচিয়ে রাখতেন দীনের নুছরত ও সাহায্য করার জন্য, আর আমরা জমা করি নিজেদের আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের জন্য।

অনুরূপভাবে নবীজী প্রদত্ত এই সুমহান দায়িত্ব যারা নবীজীর সামনে উপস্থিত ছিলেন শুধু তাদের জন্যই নয়; বরং কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা নবীজীর উপর ঈমান আনয়নকারী সকল মুমিন-মুসলমানের দায়িত্ব যে, তুমি আমার আনীত দীনের যে কথাটি শুনেছো এবং যে হুকুম-আহকাম জেনেছো তা দুনিয়াবাসীর নিকট পৌঁছে দাও। তবে দীন ও ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার পর কে ঈমান আনল আর কে আনল না সেই দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হয়নি বরং তুমি শুধু পৌঁছে দাও; হেদায়াত কাকে দেয়া হবে, আর কে বঞ্চিত হবে সেটা আল্লাহ তা'আলার যিম্মা, ইচ্ছা ও হেকমতের অধীন। তুমি আলেম নও এজন্য মনে করো না যে, এটা আমার দায়িত্ব নয় বরং আখেরী নবীর উম্মত হওয়ার কারণে এটা তোমারও দায়িত্ব। তুমি আলেম না হওয়া সত্ত্বেও তোমার দ্বারা লাখো মানুষের হেদায়েতের ফায়সালা হতে পারে। শুধু আলেম-গায়রে আলেম কেনো, হাদীসে বর্ণিত 'শাহেদ' তথা উপস্থিত শব্দটি নবীর উপর ঈমান আনয়নকারী একজন মুমিন-মুসলমানকেও তাবলীগের দায়িত্ব থেকে রেহাই দেয়নি; চাই সে কানা হোক, খোঁড়া হোক, বধির হোক এমনকি প্যারালাইজডই হোক– নিজে দীন সম্পর্কে যতোটুকু শুনেছে ও জেনেছে, আপন সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী অপরের কাছে পৌঁছে দেয়া তার যিম্মাদারী। নবীজীর এই আদেশের কারিশমা দেখুন, আজ বধিরদের জামা'আত বের হচ্ছে, অন্ধদের জামা'আত বের হচ্ছে, হিজড়াদের উপর মেহনত হচ্ছে।

তো এটা ছিল নবীজীর বিদায় হজ্জের বাণী যে, আমার কথাগুলো পৌঁছে দাও, দুনিয়াবাসীর মাঝে ছড়িয়ে দাও। এই নির্দেশ কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের উপর বলবৎ থাকবে। অন্যান্য নবীগণ কেউ পাঁচশত বৎসর দাওয়াত দিয়েছেন, কেউ নয়শত বৎসর দাওয়াত দিয়েছেন। পক্ষান্তরে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাত্র ২৩ বৎসর দাওয়াত দিয়েছেন। কারণ দাওয়াতের কাজের এই যিম্মাদারী আল্লাহ তা'আলা আখেরী নবীর উম্মতের উপর ন্যস্ত করেছেন। হ্যাঁ, আমাদের উপর এই কাজের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলাও দিয়েছেন এবং নবীজীও দিয়েছেন। এই সুমহান দায়িত্বের কারণেই কুরআনে কারীমে আমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত বলা হয়েছে; অন্য কোন কারণে নয় এবং অন্য কোন উম্মতকেও নয়। লক্ষাধিক নবীর মধ্য হতে আর কোন নবীর উম্মতকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়নি। আমরা নবী না হয়েও যে নবীওয়ালা কাজ পেয়েছি এজন্য আমাদেরকে এই উপাধি দেয়া হয়েছে। আর এটাও ব্যাপকভাবে সবাইকে নয়; বরং সাহাবায়ে কেরামকে এবং পরবর্তী যারা এই দায়িত্ব পালন করবে শুধু তাদেরকে দেয়া হয়েছে। যে এই দায়িত্ব পালন করবে না সে এই উপাধি পাবে না; বরং তার উপাধি হবে নিকৃষ্ট উম্মত! কেননা এতো বড় ফযীলত অর্জনের সুযোগ পেয়েও সে এর প্রতি অমনোযোগী ছিল! উদাহরণস্বরূপ কাউকে এলাকার চেয়ারম্যান বানানো হলো। কিন্তু সে চেয়ারম্যানীর দায়িত্ব পালন করল না। বলুন, এমন ব্যক্তিকে কি চেয়ারম্যান পদে

বহাল রাখা হবে? হবে না। তাহলে চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এতো বড় মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করলেন, এখন আমরা যদি তা পালন না করি তাহলে কিভাবে এই ফযীলত ও উপাধি বহাল থাকবে? আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক আমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার এই যে ঘোষণা, এটি যে অর্পিত দায়িত্ব পালন করার সঙ্গে শর্তযুক্ত তা আমার কথা নয় বরং দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক রাযি. এই ব্যাখ্যা করেছেন। হায়াতুস সাহাবা কিতাবে এর দলীল বর্ণিত আছে। সুতরাং দায়িত্ব পালন না করেই নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত মনে করার যে আত্মতুষ্টি আমাদের মধ্যে রয়েছে, তা থেকে বেরিয়ে আসা জরুরী। কাজ না করে সুনাম লাভের আনন্দ উপভোগ তো ইয়াহুদীদের স্বভাব। আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদেরকে এই স্বভাবের জন্য কঠিন তিরস্কার করেছেন–

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

(অর্থ:) তোমরা কিছুতেই মনে করো না যে, যারা নিজেদের কৃতকর্মের উপর বড় খুশী আর যে কাজ তারা করেনি তার প্রশংসার আশাবাদী, এরূপ লোকদের সম্পর্কে কিছুতেই মনে করো না যে, তারা শাস্তি হতে আত্মরক্ষায় সফল হবে। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে। (সূরা আলে ইমরান-১৮৮)

মুহতারাম দোস্তো, বুযুর্গো!

দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত দ্বারা হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণকে হাতেপায়ে ধরে উলামায়ে কেরামের সঙ্গে জুড়ে দেয়া। আর মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর উদ্দেশ্য ছিল উলামায়ে কেরামকে জনসাধারণের সঙ্গে জুড়ে দেয়া। হযরত থানবী রহ.-এর সঙ্গে উলামায়ে কেরামের বিশাল এক জামাআত সম্পর্ক রাখতেন। আর মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর সঙ্গে সংযোগ রাখতো জনসাধারণের এক বিরাট জামাআত। এখন এই উভয় হযরত নিজ নিজ জামাআতকে অপরের সঙ্গে জুড়ে দেয়ার মেহনত করেছেন। উভয়ের উদ্দেশ্যই এক ও অভিন্ন ছিল যে, উলামায়ে কেরাম ও জনসাধারণের মধ্যকার দূরত্ব ঘুচে যাক। হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস রহ. তাবলীগী সাথীদের বলতেন– তোমরা উলামায়ে কেরামের সঙ্গে সব সময় জুড়ে থাকবে। নামায কিভাবে পড়বে, বিবির সঙ্গে কী আচরণ করবে, সন্তানের হক কিভাবে আদায় করবে সব তাদের কাছে জিজ্ঞেস করো। সব কাজেই শরীয়তের মাসআলা আছে, কাজেই আন্দাজে ও অনুমান করে চলো না; জিজ্ঞেস করে করে চলো, কারণ তোমার কাছে ইলমের বাতি নেই, সেটা আছে আহলে ইলম অর্থাৎ উলামায়ে কেরামের কাছে। তিনি আরও বলতেন– আমার মন চায়, তালীম হোক হযরত থানবীর বাতানো উসূল অনুযায়ী আর তাবলীগ হোক আমার বাতানো উসূল অনুযায়ী।

অপরদিকে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. উলামায়ে কেরামকে বলতেন– আপনারা হলেন নবীদের ওয়ারিস; নবীদেরকে তাদের উম্মতের কাছে পাঠানো হয়েছিল। সাধারণত উম্মতরা নবীদের কাছে ঘেঁষতে চায়নি, নবীরাই তাদের কাছে গিয়ে গিয়ে দীন পৌঁছে দিয়েছেন। সুতরাং আপনাদেরকেও দীন নিয়ে উম্মতের কাছে যেতে হবে। হ্যাঁ, কেউ স্বেচ্ছায় আপনাদের কাছে দীন শিখতে আসলে সেটা তার ও আপনাদের উভয়ের সৌভাগ্য। তারা আসুক বা না আসুক তাদের কাছে দীনের দাওয়াত নিয়ে গমন করা এটা নবীদের উত্তরাধিকারী হিসেবে উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব।

মোটকথা এভাবে নিজ নিজ গণ্ডির ভেতর হযরতজী ইলিয়াস রহ. ও হযরত থানবী রহ. উভয়েই উলামা এবং জনসাধারণকে একত্রে জুড়ানোর মেহনত করেছেন। আর উম্মতের উলামায়ে কেরাম ও জনসাধারণ যদি দীনের ভিত্তিতে জুড়ে যায়, এক হয়ে যায়, দুনিয়ার কোন শক্তি ও তথাকথিত পরাশক্তি মুসলিম উম্মাহর সামান্যও ক্ষতি করতে পারবে না। এ কারণেই বর্তমানে মিডিয়াগুলো পরিকল্পিতভাবে উলামায়ে কেরামের বদনাম প্রচার করে। শুনেছি, সিনেমা-নাটকে নাকি চোর-ডাকাতের অভিনয়কারীকে জুব্বা-টুপি-দাড়ি পরিয়ে উপস্থাপন করা হয়। এগুলো দেখে দেখে আমাদের কোমলমতি শিশুরা মনে করে, টুপিওয়ালা-দাড়িওয়ালা লোকগুলো বড় ক্রিমিনাল। নাউযুবিল্লাহ। বস্তুত বেশিরভাগ মিডিয়াই কাফেরদের নিয়ন্ত্রণে। এই কাফেরদেরকেও দীনের দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে। কাফেরদেরকে দীনের দাওয়াত দেয়ার কথাটাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে। এটা মুসলমানদের কাছে কাফেরদের পাওনা ও অধিকার। তাছাড়া কাফেরদেরকে দাওয়াত দিতে থাকলে দাঈর নিজের ঈমানও নিরাপদ থাকে।

দ্বিতীয় হযরতজী মাওলানা ইউসুফ রহ. একটা কথা বলতেন যে, দাওয়াত হলো আগুনের ন্যায়, মুসলমান হলো পাকানো গোস্ত, আর কাফের হলো কাঁচা গোস্ত। পাকানো গোস্তকে দুর্গন্ধ ও পচন থেকে নিরাপদ রাখতে হলে তাকে আগুনের সোহবতে রাখতে হয়। অর্থাৎ মুসলমান নিজের ঈমানকে মজবুত ও অটল রাখতে চাইলে কাফেরদেরকে দাওয়াত দিতে হবে। তেমনিভাবে কাঁচা গোস্তকে খাওয়ার উপযোগী করতে হলেও আগুনের সোহবতে আনতে হয়। অর্থাৎ কাফেরকে মুসলমান বানাতে হলেও দাওয়াত দেয়া প্রয়োজন। উপরন্তু এটা মুসলমানদের কাছে কাফেরদের পাওনা ও হক। ঈমানের এই সম্পদ আল্লাহ তা'আলা আমাদের কাছে আমানত রেখেছেন। এই আমানতও পৌঁছে দেয়ার ফিকির রাখতে হবে।

মুহতারাম দোস্তো, বুযুর্গো!

আমরা মেহনত তো অবশ্যই করবো তবে সেটা অবশ্যই সহীহ তরীকায় এবং হিকমত ও প্রজ্ঞার সাথে। এক বৃদ্ধলোক মসজিদে নামায পড়ছিল। তার রুকু-সিজদা ঠিকমতো হচ্ছিল না। এদিকে নামাযে অভিজ্ঞ দুই শিশু বৃদ্ধের নামায পড়া দেখছিল। তারা ভেবেচিন্তে বুদ্ধি বের করল– মুরুব্বীকে তো আর সরাসরি বলা যাবে না যে, আপনার রুকু-সিজদাটা সহীহ করে নিন বরং আমরাই তাকে আমাদের নামায দেখিয়ে ঠিক করে দিতে বলি। পরিকল্পনামাফিক তারা যখন বৃদ্ধকে নিজেদের নামায দেখিয়ে ঠিক করে দিতে বলল তখন বৃদ্ধ বললেন, বেটা! তোমাদেরটাই ঠিক আছে, আমারটাই ভুল হচ্ছে; আমি ঠিক করে নিচ্ছি। বোঝা গেলো, এই কাজের জন্য হিকমতেরও প্রয়োজন রয়েছে। কথা যতোই সঠিক হোক, বলে দিলেই সেটা উপকারী হয়ে যায় না। বলারও তো নিয়ম আছে। এজন্য হক কথা বলার তরীকাও জানতে হবে। দেখুন না, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমের এক আয়াতে দীনের জন্য জিহাদ ও মুজাহাদাকে তিজারত (ব্যবসা) বলেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(অর্থ:) হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসায়ের সন্ধান দেবো, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? (তা এই যে,)

(১৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিসমিহী তা'আলা

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ায় শিক্ষাসমাপনকারীদের সমন্বয়ে গঠিত

'রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়া'র

৯ম ফুযালা সম্মেলন

স্থান

জামি'আতুল আবরার রাহমানিয়া

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ শনিবার

সকাল ৯টা হতে আসর পর্যন্ত

সম্মেলনে
রাবেতার সকল সদস্যকে
স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের
আহ্বান জানানো যাচ্ছে

কেন্দ্রের সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও রাবেতার কোনও কোনও সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব না-ও হতে পারে, এজন্য ফুযালায়ে কেরামকে পার্শ্ববর্তী/পরিচিত সদস্যদের সঙ্গে যথাসাধ্য যোগাযোগের অনুরোধ করা যাচ্ছে।

দূরবর্তী ফুযালায়ে কেরামকে সম্মেলনের আগের দিন চলে আসার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

জামি'আর পক্ষে

মুফতী মনসূরুল হক
প্রধান মুফতী ও শাইখুল হাদীস
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

মাওলানা হিফজুর রহমান
মুহতামিম
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

রাবেতার পক্ষে

মাওলানা আব্দুল কাইয়ূম আল মাসউদ
আমীরে মজলিসে শূরা
রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়া

অনন্য অসাধারণ ব্যক্তিত্ব শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফী রহ.

মাওলানা আশরাফ আলী নিজামপুরী দা.বা.

আখেরী যামানার ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়ে দীন-ইসলামের নিভু নিভু মশাল প্রজ্জ্বলিত রাখতে এবং পথহারা দ্বিধাবিভক্ত উম্মাহকে হিদায়াতের রাজপথ দেখাতে আল্লাহ তা'আলা কিছু ক্ষণজন্মা মহামনীষীকে নির্বাচন করেন, যাদের আল্লাহপ্রদত্ত প্রজ্ঞা, অসীম দূরদৃষ্টি ও পাহাড়সম অবিচলতার বদৌলতে দীনের আওয়াজ বুলন্দ হয়, বাতিলের নীলনকশা বানচাল হয় এবং বিদ'আতের কালিমা দূরীভূত হয়।

এ শ্রেণীর যে ক'জন ত্যাগী পুরুষকে বুকে ধারণ করে উপমহাদেশ বিশেষত পূর্বাঞ্চলীয় ভূ-খণ্ড তথা আজকের বাংলাদেশ খ্যাতির মহিমায় অধিষ্ঠিত, শায়খুল ইসলাম হযরতুল আল্লাম হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.-এর অন্যতম খলীফা, তবীবুল উম্মাহ, হযরতুল আল্লাম শাহ আহমদ শফী রহ. ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

এই প্রবাদপুরুষের কীর্তিমান নামটির সঙ্গে জড়িত আছে আলেম-উলামা থেকে আরম্ভ করে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষের শ্রদ্ধা মিশ্রিত অনুভূতি। হযরতুল আল্লাম মাওলানা শাহ আহমদ শফী রহ. নামটির স্মরণে ভেসে ওঠে পঙ্কিলতার আবর্তে ডুবে যাওয়া সমাজে আত্মশুদ্ধির মঞ্চে শুদ্ধতার ছড়ি হাতে এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বের ধীর-দৃঢ় কদমে পরপারের কামিয়াবী ও জান্নাতের দিকে ধাবমান এক সফল সাধকের অগণন কৃতিত্বের অমর কাহিনী।

জন্ম, শৈশব ও প্রাথমিক শিক্ষাদীক্ষা

এই মহামনীষী ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ১৩৫১ হিজরী সনে বারো আউলিয়ার পুণ্যভূমি চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া থানাধীন পাখিয়ার টিলা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম জনাব বরকত আলী, মায়ের নাম মোছাম্মৎ মেহেরুন্নেছা বেগম। শিশুকালে হযরতের পিতা-মাতা তাঁকে কুরআনে কারীম শিক্ষার জন্য জনাব মৌলভী আযীযুর রহমান রহ.-এর নিকট প্রেরণ করেন। এরই মধ্যে নিয়মতান্ত্রিক চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষাও শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর শরফভাটা মাদরাসায় প্রাথমিক কিতাব পাঠে মনোনিবেশ করেন।

তিনি ছোটবেলা থেকেই প্রখর মেধাবী হওয়ায় অল্প বয়সেই কুরআনে কারীমের বিশুদ্ধ তিলাওয়াত ও প্রাথমিক শিক্ষা-দীক্ষা সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত করতে সক্ষম হন। অতঃপর জ্ঞান আহরণের অদম্য স্পৃহা নিয়ে ছুটে যান ঐতিহ্যবাহী আল-জামি'আতুল ইসলামিয়া জিরিতে। জিরি মাদরাসায় ভর্তি হয়ে সেখানে ৫/৬ মাস অধ্যয়ন করেন। এরপর বৃটিশ ও জার্মানীর যুদ্ধদামামা বেজে ওঠে। ফলে সেখান থেকে ১৩৬১ হিজরীতে জনাব হাফেয ইমতিয়াজ সাহেবের সহযোগিতায় এশিয়া মহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম দীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দারুল উলূম মুঈনুল ইসলামে ভর্তি হন। তখন তার বয়স মাত্র ১০ বছর। ইত্যবসরে তাঁর মাতা-পিতা ক্রমান্বয়ে তাঁকে চিরকালের জন্য ইয়াতীম করে আল্লাহ পাকের ডাকে সাড়া দেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা

দারুল উলূম হাটহাজারীতে তিনি একাধারে ১০ বছর পরম আত্মত্যাগ ও খোদাপ্রদত্ত মেধা, লেখা-পড়ায় একাগ্রতা প্রভৃতি গুণাবলীর মাধ্যমে অতিক্রম করেন। সাথেসাথে যুগশ্রেষ্ঠ অসাতিযায়ে কেরামের ভালোবাসা ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে উর্দু, ফার্সী, আরবী ভাষা ও সাহিত্যসহ ইলমে নাহব, ইলমে সরফ, ইলমে ফিকহ, মানতিক, ফালসাফা, বালাগাত প্রভৃতি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে সক্ষম হন। দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীতে হযরত যাঁদের কাছে লেখা-পড়া করে ধন্য হন, সে সব আসাতিযায়ে কিরামের মাঝে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন– মুফতীয়ে আযম ফয়জুল্লাহ রহ., শায়খুল হাদীস আব্দুল কাইয়ূম রহ., শায়খুল আদব মুহাম্মদ আলী নিজামপুরী রহ., শারেহে মিশকাত আবুল হাসান বাবুনগরী রহ. প্রমুখ।

দারুল উলূম দেওবন্দ গমন

দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীতে হযরত মিশকাত শরীফ, জালালাইন শরীফ ও কাযী মুবারক ইত্যাদি কিতাব পাঠান্তে সকল প্রতিকূলতার পাহাড় ডিঙিয়ে ইলমে হাদীস ও ইলমে তাফসীরের উচ্চতর শিক্ষা হাসিল করার অদম্য বাসনা নিয়ে ১৩৭১ হিজরী সনে ছুটে যান ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র, এশিয়া মহাদেশের শ্রেষ্ঠতম দীনি বিদ্যানিকেতন দারুল উলূম দেওবন্দে। দারুল উলূম দেওবন্দে হযরত ফুনূনাতে আলিয়া, দাওরায়ে হাদীস ও উচ্চতর তাফসীরশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। দেওবন্দে অধ্যয়নকালে তিনি যাঁদের সংশ্রবে ধন্য হন, তাদের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন শায়খুল আরব ওয়াল আজম, মুজাহিদে মিল্লাত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.। দেওবন্দে অধ্যয়নরত অবস্থায়ই তিনি এই মহামনীষীর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে খেলাফতপ্রাপ্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। দারুল উলূম দেওবন্দে তাঁর সম্মানিত উস্তাদবৃন্দ হলেন–

হযরত মাওলানা সাইয়িদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. (সহীহ বুখারী), হযরত মাওলানা ইবরাহীম বলিয়াবী রহ. (সহীহ মুসলিম), শায়খুল আদব হযরত মাওলানা ইযায আলী রহ. (জামে তিরমিযী ও সুনানে আবূ দাঊদ), হযরত মাওলানা ফখরুল হাসান রহ. (সুনানে নাসায়ী); হযরত মাওলানা মুবারক রহ. (তাহাবী শরীফ); হযরত মাওলানা জলীল আহমদ রহ. (মুয়াত্তা মালেক), হযরত মাওলানা যহীরুল হাসান রহ. (মুয়াত্তা মুহাম্মদ), মাওলানা ইবরাহীম বলিয়াবী রহ. ও মাওলানা ফখরুল হাসান রহ. (ফুনূনাতে আলিয়া)

ইলম, আমল ও আধ্যাত্মিকতায় ধন্য এই মহামনীষী একাধারে ৪ বছর বিরামহীন অধ্যয়ন এবং বিশ্ববিখ্যাত আসাতিযায়ে কিরামের খেদমত ও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণের মাধ্যমে হাদীস, তাফসীর, ফিকহশাস্ত্রসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং যুগের অন্যতম মুহাদ্দিস, প্রজ্ঞাবান বুযুর্গ শায়খুল ইসলাম আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.-এর ইলমী ও আমলী প্রতিনিধি হয়ে

১৩৭৫ হিজরী সনে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

শিক্ষকতা

দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তাঁর প্রথম হিতাকাঙ্ক্ষী উস্তাদ দারুল উলূম হাটহাজারীর তৎকালীন মহাপরিচালক আল্লামা শাহ আব্দুল ওয়াহহাব রহ.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আল্লামা আব্দুল ওয়াহহাব রহ. তাঁর যোগ্যতা ও গুণাবলীর মূল্যায়নস্বরূপ তাঁকে জামি'আর শিক্ষক পদে নিয়োগ দান করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর শ্রুতিমধুর সরল ও প্রাঞ্জল অধ্যাপনার সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাযকিয়ায়ে নফস বা আত্মিক উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যেও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাঁর কাছে ছুটে আসতেন উলামায়ে কেরামসহ বিভিন্ন শ্রেণীপেশার ধর্মপ্রাণ জনসাধারণ।

দারুল উলূম হাটহাজারীতে পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ

১৪০৭ হিজরীতে জামি'আর তদানীন্তন মহাপরিচালক আল্লামা হামেদ রহ. ইন্তেকাল করলে জামি'আর মজলিসে শূরার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জামি'আ পরিচালনার গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয় হযরতুল আল্লাম শাহ আহমদ শফী রহ.-এর উপর। তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় মৃত্যু পর্যন্ত জামি'আর অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, ইলমী ও আমলী তথা সর্বক্ষেত্রেই প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। তিনি প্রধান পরিচালক হওয়ার সাথেসাথে শায়খুল হাদীসের মহান দায়িত্বও অতি দক্ষতার সাথে সুচারুরূপে আঞ্জাম দিয়েছেন। তাঁর সফল উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় দারুল উলূমের নজিরবিহীন সম্প্রসারণ ও সংস্কারের কাজ হয়েছে। এককথায় হযরতের আমলে জামি'আর উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে ব্যাপক সাফল্য আসে।

তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে জামি'আ প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে 'শতবার্ষিকী দস্তারবন্দী মহাসম্মেলন' সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে দেশ-বিদেশের প্রথিতযশা উলামায়ে কেরাম ও ইসলামী নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে জামি'আর প্রায় ১০ সহস্রাধিক ফুযালায়ে কেরামকে দস্তারে ফযীলত প্রদান করা হয়। উক্ত শতবার্ষিকী মহাসম্মেলনের পর ২০02 খ্রিস্টাব্দে তাঁর তত্ত্বাবধানেই সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয় 'সপ্তবার্ষিকী দস্তারবন্দী সম্মেলন'। জামি'আর উস্তাদ-ছাত্র সবার জন্যই হযরত বটবৃক্ষসদৃশ ছিলেন। যে কারো আপদ-বিপদ ও সমস্যা-সংকটে হযরত পরম মমতায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেন।

সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম

অপরদিকে সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তাঁর প্রচেষ্টার কমতি ছিল না। আপন উস্তাদ ও পীর শায়খুল ইসলাম আল্লামা সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.-এর সংগ্রামী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে শরীক হয়েছিলেন তিনি। তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দীন প্রতিষ্ঠার মহৎ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ইসলামী রাজনৈতিক দল ও আন্দোলনের সমর্থক ও সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন।

হেফাজতে ইসলাম-এর সূচনা

'হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ' আল্লামা শাহ আহমদ শফী রহ.-এর অমর কীর্তি। এটি বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ অরাজনৈতিক সংগঠন। ২০১০ সালের ১৯ জানুয়ারী হাটহাজারী মাদরাসা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক উলামা সম্মেলনে 'হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ' গঠন করা হলে আল্লামা আহমদ শফী রহ.-কে এর আমীর মনোনীত করা হয়। এই সংগঠনের ব্যানারে তিনি দীনে ইসলামের বহুবিধ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। ইসলাম ও ইসলামী ভাবধারার বিরুদ্ধে যখনই কোন শক্তি ও ব্যক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তিনি মুসলমানদের ঈমান-আকীদার হেফাজতের স্বার্থে এই সংগঠনের ব্যানারে উচ্চকণ্ঠ হয়েছেন এবং এদেশের ইসলামপ্রিয় জনগণকে জাগিয়ে তুলেছেন। ধর্মহীন শিক্ষানীতি ও কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী নারীনীতির বিরুদ্ধেও সফল আন্দোলন পরিচালনা করেছেন তিনি।

হেফাজতের লংমার্চ ও শাপলায় গণজাগরণ

২০১৩ সালে শাহবাগে গণজাগরণ মঞ্চ কর্তৃক যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে কেন্দ্র করে নাস্তিক্যবাদীদের এক ভয়ংকর ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। তারা আল্লাহ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ইসলামের বিভিন্ন বিধি-বিধান নিয়ে কটূক্তি ও কুৎসা রটনা করেছিল। আলেম-উলামাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার হীন চেষ্টা চালিয়েছিল। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে হরদম মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দিয়ে জাতিকে বিভক্ত করার অপতৎপরতা চালিয়েছিল। ইসলামবিদ্বেষী এসব অপকর্মের বিরুদ্ধে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ঢাকার শাপলা চত্বর অভিমুখে লংমার্চের ঘোষণা দেয়। পরবর্তীকালে ৬ এপ্রিল রাজধানী ঢাকার প্রাণকেন্দ্র শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের উদ্যোগে এক ঐতিহাসিক নজিরবিহীন লংমার্চ অনুষ্ঠিত হয়। এই লংমার্চ শুধু বাংলাদেশে নয়; উপমহাদেশের ইতিহাসে এক বিরল রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল। সেদিন ২৭টি সংগঠন দিয়ে হরতালের আহবান করে যানবাহন, বাস, ট্রাক, ট্রেন, লঞ্চ, স্টিমার, ট্রলার, ফেরিসহ সবকিছুই সরকারী বা বেসরকারীভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তৌহিদী জনতা এই বাধা মানেনি। চৈত্রের খরতাপের মধ্যেও ৫০/৬০ কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হেঁটে সম্মেলনস্থলে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন তারা। যারা আসতে পারেননি তারা চট্টগ্রাম, বরিশাল, ময়মনসিংহ, সিলেট, রাজশাহী, খুলনা, বগুড়াসহ দেশের বিভাগীয় ও জেলা সদরে অবস্থান করে শাপলার সমাবেশের প্রতি একাত্মতা জানিয়েছেন। আল্লামা শাহ আহমদ শফী রহ.-এর ইখলাস ও তাঁর প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ মানুষকে সেই ঐতিহাসিক লংমার্চে পঙ্গপালের মতো টেনে এনেছিল। শাপলা চত্বরের লংমার্চ থেকে হেফাজতে ইসলাম ১৩ দফা দাবি ঘোষণা করে সেগুলো মেনে নেয়ার জন্য ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয়। এই দাবিতে হেফাজতে ইসলাম ৮ এপ্রিল সোমবার সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালন করে এবং ঘোষণা দেয় যে, যদি ৩০ এপ্রিলের মধ্যে ১৩ দফা দাবি মেনে নেয়া না হয় তাহলে ৫ মে 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচি পালন করা হবে। তৎপরবর্তীকালে সরকার হেফাজতে ইসলামের ১৩ দফা দাবি মেনে না নেয়ায় ৫ মে হেফাজত তাদের নির্ধারিত কর্মসূচী 'ঢাকা অবরোধ' পালন করে এবং অবরোধের মাধ্যমে বিশ্বইতিহাসের এক অনন্য রেকর্ড সৃষ্টি করে। সেই দিনটি ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় জাগরণের দিন।

বাংলাদেশ ১৯৬৯-এর গণ আন্দোলন দেখেছে; জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে গণবিস্ফোরণ দেখেছে, কিন্তু ৫ মে হেফাজতে ইসলামের ঐতিহাসিক 'ঢাকা অবরোধ' ও মহাসমাবেশের কাছে সবগুলো তুচ্ছ মনে হয়। পিছনের গণআন্দোলনগুলোর কোনটিতেই আসার পথে বাধা ছিল না। কিন্তু হেফাজতের 'ঢাকা অবরোধ' ছিলো বিপরীত চিত্র। বিশ্লেষকদের ধারণা, সরকার যদি কোন ধরনের বাধার সৃষ্টি না করতো তাহলে

শাপলা চত্বরের মহাসমাবেশে আগত ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সংখ্যা কোটির কোটা অতিক্রম করত।

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণভাবে ঢাকা অবরোধ করেছিল, যা শান্তিপূর্ণ ও সর্ববৃহৎ আন্দোলন হিসেবে ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কিন্তু সরকার তাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে সহ্য করতে না পেরে রাতের আঁধারে লাইট নিভিয়ে দিয়ে রচনা করে ইতিহাসের এক বর্বর জঘন্যতম কালো অধ্যায়। তারা ঘুমন্ত ও জিকিররত তৌহিদী জনতার উপর চালায় বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞ। ইতিহাসের পাতায় তা 'কালোরাত' হিসেবে লেখা থাকবে। বাংলাদেশের মুসলমান এবং ইসলামী আন্দোলনের মহাজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফী রহ.-এর হাত ধরে। তিনি দল-মত নির্বিশেষে সকল তৌহিদী জনতাকে এককাতারে নিয়ে এসেছিলেন। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ অরাজনৈতিক সংগঠন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের ব্যানারে সকলেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাঠে নেমে এসেছিলেন তাঁরই ডাকে। ইসলামী জাগরণে তাঁর অসামান্য অবদানের কথা এত স্বল্পপরিসরে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এককথায় তাঁকে ইসলামী জাগরণের এক 'অবিসংবাদিত নেতা' উপাধিতে ভূষিত করা যায়। পীরে কামেল, শায়খুল হাদীস, লেখক, খতীব, ওয়ায়েজ, মাদরাসার পরিচালক, সংগঠনের আমীর, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও গবেষকসহ বহু অভিধায় তাঁকে অভিহিত করা যায়; সবকিছু ছাপিয়ে তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয়, তিনি সাদামনের বিশাল হৃদয়ের এক মহান ব্যক্তিত্ব। শিশুসুলভ সরল হাসি আর যোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে এদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার মন জয় করে নিয়েছিলেন তিনি। তিনি বাংলার আপামর জনসাধারণের মাঝে কী রকম প্রভাব তৈরি করেছিলেন শাপলার গণজাগরণই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

শানে রিসালাত সম্মেলন

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও জীবনাদর্শকে সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে দেশব্যাপী শানে রিসালাত সম্মেলন চালু করেন। শানে রিসালাত সম্মেলনের মাধ্যমে তিনি নবীজীর বিরুদ্ধে কটূক্তিকারীদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। শাইখুল ইসলামের আহবানে সারা দেশে একেকটি শানে রিসালাত সম্মেলনে লাখ লাখ মুসলমান শরীক হতো। উক্ত শানে রিসালত সম্মেলনে বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের বড় বড় উলামায়ে কেরাম অংশগ্রহণ করতেন।

কওমী সনদের স্বীকৃতি ও আল-হাইয়াতুল উলয়া লিল-জামি'আতিল কওমিয়া প্রতিষ্ঠা

তিনি ২০১২ সালে কওমী সনদের সরকারী স্বীকৃতির জন্য গঠিত 'জাতীয় কওমী শিক্ষা কমিশন'-এর চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁর হাত ধরেই কওমী মাদরাসার দাওরায়ে হাদীসের সনদের সরকারী স্বীকৃতি নিয়ে সৃষ্ট দীর্ঘদিনের জটিলতার অবসান হয়। সূচনা হয় এক নতুন ইতিহাসের। দাওরায়ে হাদীসের (তাকমীল) সনদ মাস্টার্স ডিগ্রি (ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবী) সমমান ঘোষণা করা হয়েছে। জাতীয় সংসদে 'আল-হাইআতুল উলয়া লিল-জামি'আতিল কওমিয়া বাংলাদেশ'-এর অধীনে এ সংক্রান্ত বিল পাস হয়েছে। বিলে বলা হয়েছে, কওমী মাদরাসাগুলো দারুল উলূম দেওবন্দের নীতি, আদর্শ ও নিসাব (পাঠ্যসূচী) অনুসারে পরিচালিত হবে। সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ বা নজরদারীর ব্যবস্থা রাখা হয়নি আইনে। ২০০৮ সালে তিনি কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড (বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া)-এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। দেশের সর্ববৃহৎ কওমী শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান হওয়ার পর থেকেই কওমী সনদের সরকারী স্বীকৃতির দাবীকে জোরালো করার চেষ্টা করে যান তিনি। ফলে বাংলাদেশ সরকার তাঁর হাতে কওমী সনদের সরকারী স্বীকৃতি তুলে দিয়ে তাঁকে সম্মানে ভূষিত করেন ।

দীনী প্রতিষ্ঠানসমূহের পৃষ্ঠপোষকতা ও আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তা

আল্লামা শাহ আহমদ শফী রহ. কেবল চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদরাসার পরিচালকই নন; বরং তিনি সারাদেশে কয়েক শ' কওমী মাদরাসার পৃষ্ঠপোষক, মুরব্বী ও সদরে মুহতামিম ছিলেন, যেগুলো সরাসরি তাঁর পরামর্শ ও নির্দেশনায় পরিচালিত হতো। বর্তমানে ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, লন্ডন, দুবাই, কাতার, বাহরাইন, কুয়েত, ওমান তথা মধ্যপ্রাচ্যসহ গোটা উপমহাদেশে ছড়িয়ে রয়েছে হযরতের ইলম ও প্রজ্ঞার উৎস থেকে অনুপ্রেরণা লাভকারী ছাত্র, মুরীদ ও অনুসারী। বিশেষ করে আরব দেশগুলোতে রয়েছে হযরতের আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তা। তাঁর নম্রতা, খোদাভীরুতা, ইলম ও প্রজ্ঞা দেখে পবিত্র হারাম শরীফের ইমামগণ তাকে শাইখ বলে সম্বোধন করে থাকেন।

একটি ঈর্ষণীয় সম্মান লাভ

বিগত ১৯ আগস্ট ২০০১ তারিখে লন্ডন থেকে দেশে ফেরার পথে পবিত্র উমরা পালনের উদ্দেশ্যে সৌদী আরব গমন করলে হারামাইন শরীফাইনের মহাপরিচালক শায়খ সালেহ আল-হুমাইদের সঙ্গে তিনি সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। এ সময় শায়খ সালেহ আল-হুমাইদ হযরতকে পবিত্র কাবা শরীফের গিলাফের একটি অংশ হাদিয়া স্বরূপ প্রদান করে সম্মানিত করেন। এছাড়াও বাংলাদেশ জাতীয় সীরাত কমিটি কর্তৃক তাকে ২০০৫ সালের 'শ্রেষ্ঠ ইসলামী ব্যক্তিত্ব' ঘোষণা করে স্বর্ণপদক প্রদান করেন।

সূর্যের আলোকরশ্মি যেমনিভাবে বিশ্ববাসীকে পথ দেখায়, ঠিক তেমনি একজন সত্যিকারের নায়েবে নবীও বিশ্ববাসীকে সত্যের সন্ধান দিতে সক্ষম। মুসলিম উম্মার এই ত্যাগী, সংগ্রামী, শিক্ষানুরাগী, বিপ্লবী সমাজ সংস্কারক আল্লামা শাহ আহমদ শফী রহ. জীবনের সূচনা থেকে শিরক-বিদ'আত, কবরপূজা, মাজারপূজা তথা সকল প্রকার কুসংস্কার উচ্ছেদের ক্ষেত্রে সদাজাগ্রত ছিলেন।

বয়ান-বক্তৃতা

হযরতের আবেগঘন, জ্বালাময়ী ও সারগর্ভ উপস্থাপনা দেশজুড়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। বাংলার সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের মানসপটে তাওহীদের বাণী পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি প্রতিনিয়ত ওয়াজ-বক্তৃতা ও গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করতেন। তার আকর্ষণীয় বক্তৃতা শ্রবণ করে অসংখ্য বনী-আদম ফিরে এসেছেন কুসংস্কার ও অন্ধ অনুসরণের বেষ্টনী থেকে। ঠিক তেমনিভাবে ঈমান-আকীদা ও কাঙ্ক্ষিত পথের সঠিক সন্ধান পেয়ে ধন্য হয়েছেন ভিত্তিহীন ধারণায় জর্জরিত, কিংকর্তব্যবিমূঢ় অগণিত মানব সন্তান। মাঝেমধ্যে হযরত জামি'আর বাইতুল করীম প্রধান জামে মসজিদে জামি'আর শিক্ষার্থীদের মাঝে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে দিকনির্দেশনামূলক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করতে গিয়ে বলতেন,

'হে জামি'আর সুযোগ্য সন্তানেরা! তোমাদেরকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, তোমরাই দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। দেশের লক্ষ-কোটি ধর্মপ্রাণ তৌহিদী জনতাকে ধর্মীয় ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও পশ্চিমা কৃষ্টি-কালচার, তাহযীব তামাদ্দুন-এর করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করার ভয়ঙ্কর চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা তোমাদেরকেই করতে হবে। ইসলামী ঝাণ্ডার ধারক ও বাহক হয়ে ইসলামের

সুদৃঢ় সীমান্ত রক্ষায় অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকায় তোমাদেরকেই অবতীর্ণ হতে হবে। কাজেই ইলম, আমল ও সচ্চরিত্রের আসমানী শক্তি সঞ্চয় করে তাগুত তথা সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণে নিজেদেরকে তৈরি করে নাও।'

এমনিভাবে বাহাস-মুবাহাসা তথা তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে সমাজ থেকে কুসংস্কার ও বিদ'আতকে দূরীভূত করার ব্যাপারে হযরতের অবদান অতুলনীয়।

নিয়মানুবর্তিতা

কর্মময় জীবনে হাজারো ব্যস্ততা সত্ত্বেও সময় ও নিয়মানুবর্তিতা হযরতের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। দিবারাত্রি মূল্যবান সময়গুলোকে বিভিন্নভাগে বিভক্ত করে অধ্যাপনা ও মাদরাসা পরিচালনার সাথেসাথে নামায, তিলাওয়াত, যিকির-আযকার, দর্শনার্থী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সাক্ষাৎদান ইত্যাদি সম্পাদন করতেন।

ব্যক্তিগত ইবাদত ও তাকওয়া-তাহারাত

গভীর রজনীতে বিশ্ববাসী যখন গভীর নিদ্রায় বিভোর, ঠিক সেই মুহূর্তে নিদ্রা ত্যাগ করে জরুরত সেরে দাঁড়িয়ে যেতেন তাহাজ্জুদে এবং একান্ত নির্জনে বসে আদায় করতেন বিভিন্ন ধরনের অযীফা। কায়মনোবাক্যে দোয়া করতেন নিজের জন্য, দেশের জন্য, মুসলিম উম্মাহর জন্য। এককথায় চূড়ান্ত পর্যায়ের মুত্তাকী ও পরহেজগার, খোদাভীরু, তাকওয়া ও পরহেজগারীর মূর্তপ্রতীক এই মহান ব্যক্তিত্ব আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত থাকতে সাধনায় সদা নিজেকে নিমগ্ন রাখতেন। প্রকাশ্যে-গোপনে, শয়নে-স্বপনে, সরবে-নীরবে, আনন্দে-বেদনায়, সুখে-দুঃখে, সুস্থতায়–অসুস্থতায়, ভ্রমণে-বাসস্থানে মোটকথা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে হযরতের তাকওয়ার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত ভবিষ্যৎ-প্রজন্মের জন্য চির অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।

আধ্যাত্মিক খেদমত

যেমনিভাবে হযরতের ইলমে জাহেরীর মাধ্যমে অসংখ্য লোক হিদায়াতের দিকনির্দেশনা পেয়েছিলেন তেমনিভাবে হযরতের ইলমে বাতেনী অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মাধ্যমেও বহুলোক আত্মশুদ্ধির মহাদৌলত লাভ করতে পেরেছিলেন। আধ্যাত্মিক ধারায় হযরতের কাছ থেকে এ পর্যন্ত প্রায় সহস্রাধিক ভাগ্যবান সরাসরি ইজাযতপ্রাপ্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এর আংশিক তালিকা হযরতের লিখিত 'ফুয়ূযাতে আহমদিয়া' গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

রচনাবলী

কলমী-জিহাদের ময়দানেও রয়েছে হযরতের অসাধারণ জ্ঞান-গবেষণার দুর্লভ প্রতিফলন। হাজারও ব্যস্ততার মধ্যে শিরক-বিদ'আত ও বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে রচনা করেছেন মূল্যবান সব গ্রন্থ। লেখালেখির ময়দানে হযরতের ক্ষুরধার কলম ছিল বাতিলের জন্য সাক্ষাৎ-আতংক। হযরত রহ.-এর রচিত কিতাবাদি বাতিলের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে। এসব গ্রন্থ দ্বারা উলামায়ে কেরামের পাশাপাশি সাধারণ মুসলমানও যথেষ্ট উপকৃত হয়েছেন এবং হচ্ছেন। ভ্রান্ত মতবাদের মুখোশ উন্মোচন করে রচিত সর্বাধিক সমাদৃত গ্রন্থাবলী এই–

০১. আল-বায়ানুল ফাসিল বাইনাল হাক্কি ওয়াল-বাতিল (উর্দূ)
০২. আল-ফায়যুল জারী (বুখারী শরীফ একাংশের ব্যাখ্যাগ্রন্থ) (উর্দূ)
০৩. আল-হুজাজুল ক্বাতিয়া লিদাফইন নাহজিল খাতিয়া (উর্দূ)
০৪. আল-খায়রুল কাসীর ফী উসূলিত তাফসীর (উর্দূ)
০৫. ইসলাম ওয়া সিয়াসাত (উর্দূ)
০৬. ইযহারে হাকীকত (উর্দূ)
০৭. তাকফীরে মুসলিম (উর্দূ)
০৮. চান্দ ওয়ায়েযা (উর্দূ)
০৯. ফুয়ূযাতে আহমদিয়া (উর্দূ)
১০. হক ও বাতিলের চিরন্তন দ্বন্দ্ব (বাংলা)
১১. ইসলামী অর্থব্যবস্থা (বাংলা)
১১. ইসলাম ও রাজনীতি (বাংলা)
১২. ইজহারে হাকীকতঃ বাস্তব দৃষ্টিতে মওদুদী মতবাদ (বাংলা)
১৩. তাকফীরে মুসলিম বা মুসলমানকে কাফের বলার পরিণাম (বাংলা)
১৪. সত্যের দিকে আহ্বান করুন (বাংলা)
১৫. ধূমপান কি আশীর্বাদ না অভিশাপ (বাংলা)
১৬. একটি সন্দেহের অবসান (বাংলা)
১৭. একটি গুরুত্বপূর্ণ ফতোয়া (বাংলা)
১৮. তাবলীগ একটি অন্যতম জিহাদ (বাংলা)
১৯. ইসমতে আম্বিয়া ও মিয়ারে হক (বাংলা)
২০. বাইয়াতের হাকীকত এবং
২১. সুন্নাত ও বিদআত

এগুলো ছাড়াও উর্দূ-বাংলা ভাষায় হযরতের আরো অনেক মূল্যবান গ্রন্থ যন্ত্রস্থ রয়েছে।

আমরা তথা সমগ্র জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই বুযুর্গ হযরতুল আল্লামা শাহ আহমদ শফী রহ.-কে পেয়ে গৌরবান্বিত বোধ করেছিলাম। তিনি কেবল গতানুগতিক একজন মুহতামিম বা শাইখুল হাদীস ছিলেন না, বরং ইতিহাস সৃষ্টিকারী প্রতিভাবান ব্যক্তি গঠনের এক অভিনব কারিগর ছিলেন। তাই তো আজ বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছেন যে, হযরতের হাতেগড়া অসংখ্য ভক্ত ও শাগরিদ বিশ্বের আনাচে-কানাচে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থেকে দীনের সুঘ্রাণ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। এক কথায় যে আদর্শ পুরুষের প্রজ্ঞাময় আচরণে ও ব্যক্তিত্বে প্রিয় নবীর শিক্ষা ও আদর্শের পরিপূর্ণ প্রতিফলন ঘটে, যাঁদের দেখে হযরত সাহাবায়ে কেরামের অবয়ব চোখের সামনে ভেসে ওঠে, সেরকম একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন হযরত আল্লামা শাহ আহমদ শফী রহ.।

অসুস্থতা ও ইন্তেকাল

৯১ বছরের এই দীর্ঘ জীবনে শাইখ রহ.-এর শেষ সময়গুলো ছিল ভিন্ন রকম। একদিকে বার্ধক্যজনিত রোগ শরীরে লেগেই ছিল, সাথে সাথে ডায়াবেটিক, উচ্চরক্তচাপসহ আরো বিভিন্ন রোগ শাইখ রহ.-এর শরীর ঘিরে রেখেছিল। এত সব সমস্যা এবং কষ্ট শরীরে নিয়ে শাইখ রহ. তিন দশকেরও বেশি সময় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে উম্মুল মাদারিস দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসা পরিচালনা করেছিলেন। উম্মাহর সংকটময় মুহূর্তে সামনের সারিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। রাতদিন অবিরাম ইলমে হাদীসের দরস দিয়েছিলেন। এ সময়গুলোতে শাইখ রহ.-এর শরীর মাঝেমধ্যে সংকটাপন্ন অবস্থায় চলে যেতো। আমরা আশাহত হতাম; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাকে বারবার আমাদের মাঝে ফিরিয়ে দিতেন। সর্বশেষ গত রমজানে (১৪৪১ হিজরী) থেকেই শায়খ রহ. খুব দুর্বল হয়ে পড়েন। স্বাভাবিক কার্যক্রম থেকে অনেকটা অক্ষম হয়ে পড়েন। এ সময়গুলোতে কয়েকবার চট্টগ্রাম এবং ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ কিছু হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ)-তে সার্বক্ষণিক ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা নিয়েছিলেন। তবে শেষবার অনেকটা সুস্থ হয়ে আসলেও, অক্ষমতা এবং অপারগতা শরীরের সাথে স্থায়ী হয়ে আসলো। তারপরও শাইখ রহ.-এর আওয়াজ ও বোধশক্তি স্পষ্ট ছিল। জামি'আর শিক্ষকবৃন্দদের ডেকে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা দিতেন এবং সব কিছুর তদারকি করতেন তিনি।

(২৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মূর্তি ও ভাস্কর্যপ্রীতি : ইসলাম কী বলে?

মাওলানা মাকসূদুর রহমান

ইসলামের যে বিষয়গুলোর নিষিদ্ধতা অকাট্য ও মুতাওয়াতিরভাবে প্রমাণিত তার মধ্যে প্রাণীর প্রতিকৃতি নির্মাণ একটি। এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর ইজমা তথা ঐকমত্য রয়েছে। দেশের উলামায়ে কেরাম মূলত এই ঐকমত্য পথ ও মতটি উম্মাহর সামনে তুলে ধরার প্রয়াস চালাচ্ছেন। কোন রাজনৈতিক পছন্দ-অপছন্দ থেকে তাদের এই বক্তব্য নয়। বিধানগত বিচারে প্রতিকৃতি নির্মাণ নিয়ে আমরা কয়েকটি কাঠামোতে আলোচনা করতে পারি।

এক. পূজার জন্য প্রতিকৃতি নির্মাণ

পূজার জন্য প্রতিকৃতি নির্মাণ সর্বাবস্থায় হারাম ও নিষিদ্ধ; চাই প্রাণীর প্রতিকৃতি হোক কিংবা প্রাণহীন বস্তুর। কোনও মুসলমানের জন্য পূজার উদ্দেশ্যে কোনও ধরনের প্রতিকৃতি নির্মাণ অনুমোদিত নয়। তবে প্রতিমাপূজারীরা কিছু করলে তার দায়ভার তাদেরই উপর বর্তাবে।

দুই. পূজা ছাড়া ভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রতিকৃতি নির্মাণ

যে প্রতিকৃতি পূজা ছাড়া ভিন্ন কোন উদ্দেশ্যে গড়া হয় তার বিধান হলো–

প্রাণীর প্রতিকৃতি হলে সর্বোতভাবে হারাম; চাই তা যে নামেই নির্মাণ করা হোক। মূর্তি, ভাস্কর্য ইত্যাদি শাব্দিক ভিন্নতা হুকুমের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করবে না। মুসলমানের জন্য এমন প্রতিকৃতি নির্মাণ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কুরআন-সুন্নাহ বিশ্লেষণ করলে মৌলিকভাবে এর নিষিদ্ধতার তিনটি কারণ বোঝা যায়–

(ক) আল্লাহর সৃষ্টিগুণের সাদৃশ্য অবলম্বন করা হয়।

(খ) পৌত্তলিক ও কাফেরদের অনুরূপ কর্ম সম্পাদন করা হয়।

(গ) এসব নির্মাণের পর এ সবের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা ক্রমেক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে একপর্যায়ে তা শিরকে লিপ্ত হওয়ার কারণ হয়।

উল্লিখিত তিনটি কারণ থেকে মুক্ত হয়ে প্রাণীর ভাস্কর্য বা মূর্তি নির্মাণ কি আদৌ সম্ভব? অথচ এসব কারণের মধ্য থেকে যে কোন একটি কারণের উপস্থিতি মূর্তি নির্মাণ নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

এ ব্যাপারে হাদীসের ভাষ্য লক্ষ্য করুন–

قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً.

(অর্থ:) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, ঐ লোকের চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে আমার সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করতে চায়? তাদের যদি সামর্থ্য থাকে তাহলে একটি শস্যদানা কিংবা একটি অণুকণা সৃষ্টি করে দেখাক! (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৯৫৩)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ.

(অর্থ:) যারা প্রাণীর প্রতিকৃতি তৈরি করে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। তাদেরকে বলা হবে, যা তোমরা সৃষ্টি করেছিলে তাতে প্রাণ সঞ্চার করো। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৯৫১)

আল্লামা ইবনে আব্দুল বার রহ. বলেন, হাদীসের এ অংশ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ (যা তোমরা সৃষ্টি করেছিলে তাতে প্রাণ সঞ্চার করো) থেকে বোঝা যায়, প্রতিকৃতি দ্বারা প্রাণীর প্রতিকৃতি উদ্দেশ্য। (আত-তামহীদ ৮/৫২৭)

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন,

فلما رآه تغير لونه وهتكه بيده ثم قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله

(অর্থ:) ছবিযুক্ত পর্দা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার রঙ পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি নিজ হাতে তা ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন, কিয়ামত দিবসে প্রতিকৃতি তৈরিকারীদের কঠিনতম শাস্তি হবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ২৫৭১৮)

যারা প্রতিকৃতি তৈরি করে তাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(অর্থ:) এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকৃষ্টতম সৃষ্টি। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৪২৭)

ভালো নিয়তে মূর্তি-ভাস্কর্য নির্মাণ অতীতে শিরকে লিপ্ত হওয়ার কারণ হয়েছে

নূহ সম্প্রদায় কর্তৃক মূর্তিপূজার সূচনা সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে–

فكانت لحمير لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت.

(অর্থ:) (ওয়াদ্দ, সুওয়া' ইয়াগুস, ইয়াঊক, নাস্‌র) এগুলো হলো ঐ সম্প্রদায়ের নেককার ব্যক্তিদের নাম। যখন তারা মৃত্যুবরণ করলো, শয়তান ঐ সম্প্রদায়কে নির্দেশ দিলো যে, তাদের ইবাদতের স্থানে তাদের প্রতিকৃতি তৈরি করো। তারা তাই করলো। এ সময় তারা এগুলোর ইবাদত করতো না। অতঃপর প্রতিকৃতি তৈরিকারী প্রজন্ম মৃত্যুবরণ করলো। পরবর্তী প্রজন্ম প্রতিকৃতিগুলোর প্রকৃত পরিচয় ও উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে গেলো। ফলে নতুন প্রজন্ম সেগুলোর উপাসনা শুরু করে দিলো। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৪৬৩৬)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

وأيضا فإن اللات كان سبب عبادتها تعظيم قبر رجل صالح كان هناك.

(অর্থ:) লাত প্রতিমার পূজার সূচনা হয়েছিলো একজন নেককার ব্যক্তির কবরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সূত্রেই। (ইকতিযাউস সিরাতিল মুসতাকীম ২/৩৩৩)

উল্লিখিত বর্ণনাগুলোতে দেখা যাচ্ছে, মূর্তিপূজার সূচনাকালে প্রাণীর মূর্তি বা ভাস্কর্য নির্মাণ পূজার জন্য হতো না; বরং ভালো ব্যক্তিদের আদর্শ ও স্মৃতি ধরে রাখার জন্যই নির্মাণ করা হতো। কালক্রমে এটাই মানুষের মূর্তিপূজায় লিপ্ত হওয়ার কারণ হয়েছে। এজন্য শরীয়তে মুহাম্মাদীতে প্রাণীর প্রতিকৃতি নির্মাণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে উম্মতের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইমাম নববী রহ. বলেন,

وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره

(অর্থ:) এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, ছায়াবিশিষ্ট মূর্তি বা ভাস্কর্য নির্মাণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং এমন কিছু নির্মাণ করা হলে তা নষ্ট করে ফেলা

আবশ্যক। (শরহে নববী লি-মুসলিম ১৪/৮৭)
ইবনুল আরাবী রহ. বলেন,

أن الصورة إذا كان لها ظل حرم بالإجماع سواء كانت مما يمتهن أم لا

(অর্থ:) যে প্রতিকৃতি ছায়াবিশিষ্ট অর্থাৎ মূর্তি/ভাস্কর্য তা উম্মতের ঐকমত্যের ভিত্তিতে হারাম এবং তার ব্যবহারও হারাম; চাই সম্মানজনক ব্যবহার হোক বা অপদস্থতামূলক ব্যবহার হোক। (ফাতহুল বারী ১০/৩৮৮)

কুরআনে বর্ণিত 'তিমছাল' দ্বারা কী উদ্দেশ্য?

কুরআনে মূর্তি, ভাস্কর্য ও প্রতিমা বোঝানোর জন্য বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ 'তিমছাল', 'আনছাব', 'আছনাম'। এর মধ্যে 'আনছাব' ও 'আছনাম' দ্বারা পূজনীয় মূর্তি বোঝানো হয়েছে। আর 'তিমছাল' শব্দটি কোথাও প্রতিমা ও পূজনীয় মূর্তি বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, আবার কোথাও প্রাণহীন বস্তুর প্রতিকৃতি বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃত কথা হলো, 'তিমছাল' শব্দটি মূলগত ব্যবহারে প্রাণী ও প্রাণহীন উভয় প্রকার প্রতিকৃতি বোঝানোর জন্য ব্যবহার হয়।
আল্লামা যামাখশারী রহ. বলেন,

لأنّ التمثال كل ما صوّر على مثل صورة غيره من حيوان وغير حيوان

(অর্থ:) কোন কিছুর সদৃশ যে প্রতিকৃতি তৈরি করা হয় সেটাই 'তিমছাল'; প্রাণীর হোক কিংবা প্রাণহীন বস্তুর। (তাফসীরে কাশশাফ ৩/৫৫৫)
আল্লামা আইনী রহ. বলেন,

والتمثال يكون فيه وفي غيره

(অর্থ:) 'তিমছাল' শব্দটি যেমনিভাবে প্রাণীর আকৃতি বোঝানোর জন্য ব্যবহার হয় তেমনিভাবে প্রাণহীন বস্তুর আকৃতি বোঝানোর জন্যও ব্যবহার হয়। (উমদাতুল কারী; অধ্যায়: আযাবুল মুছাওইরীন ইয়াওমাল কিয়ামাহ)
কুরআন-সুন্নাহয় শব্দটি উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখন কথা হলো, কোথায় কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তা কাদের বক্তব্য দ্বারা নির্ধারিত হবে? পরিষ্কার কথা হলো, সাহাবা-তাবেয়ীদের বক্তব্য এবং কুরআন-সুন্নাহর অন্যান্য দলীলের আলোকে উলামায়ে উম্মত তা নির্ধারণ করবেন এবং তারা তা করেছেনও। ব্যবহারিক এই ভিন্নতার দৃষ্টান্ত হলো সূরা আম্বিয়ার ৫৭ নং আয়াত। এখানে 'তিমছাল' শব্দটি প্রতিমা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কোথাও 'তিমছাল' শব্দটি প্রাণহীন বস্তুর ভাস্কর্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন সূরা সাবার ১৩ নং আয়াত।
ইমাম যামাখশারী রহ. বলেন, সূরা সাবার ১৩ নং আয়াতে 'তিমছাল' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রাণহীন বস্তুর ছবি; যেমন গাছাগাছালি ইত্যাদি। (তাফসীরে কাশশাফ ৩/৫৫৫) সুতরাং আল্লামা যামাখশারীর ব্যাখ্যা অনুযায়ী বলা যায়, পূর্ববর্তী শরীয়তেও প্রাণীর মূর্তি নির্মাণ বৈধ ছিলো না এবং কুরআনে কারীমে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের যুগে যে 'তিমছাল' তৈরির কথা বলা হয়েছে তা ছিল প্রাণহীন বস্তুর প্রতিকৃতি। বাইবেলের বর্ণনা থেকেও এমনটি বোঝা যায়–
Do not Make for your selves images of anything in haven or on earth or in the water under the earth. (Good news bible; Page 80)
এমনিভাবে পূর্ববর্তীদের যারা প্রতিকৃতি তৈরি করতো তাদের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(অর্থ:) এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকৃষ্ট সৃষ্টি। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৪২৭)
উল্লিখিত বর্ণনা থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বেও প্রাণীর প্রতিকৃতি তৈরি করা হারাম ছিলো।
তবে যারা উল্লিখিত আয়াত দ্বারা প্রাণীর প্রতিকৃতি তৈরি উদ্দেশ্য নিয়েছেন, তারাও এ ব্যাপারে একমত যে, পূর্ববর্তী শরীয়তে যা-ই থাকুক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তে মুসলমানের জন্য প্রাণীর প্রতিকৃতি তৈরি করা সম্পূর্ণ হারাম।
ইমাম নববী রহ. বলেন,

فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهات لخلق الله تعالى.

(অর্থ:) সর্বাবস্থায় প্রাণীর প্রতিকৃতি তৈরি করা হারাম। কারণ, এতে আল্লাহর সৃষ্টিগুণের সাদৃশ্য অবলম্বন করা হয়। (শরহু মুসলিম লিন-নববী; অধ্যায়: তাহরীমু তাসবীরি সূরাতিল হাইওয়ান)

শিশুদের খেলনা দ্বারা মূর্তি ও ভাস্কর্যের পক্ষে প্রমাণ গ্রহণের কোন সুযোগ আছে কি?

মূর্তি/ভাস্কর্যের বিধান আলোচনায় শিশুদের খেলনার কথা টেনে আনা উদ্দেশ্য প্রণোদিত। দু'টি বিষয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। নবীযুগে শিশুদের খেলনা প্রকৃত অর্থে মূর্তি বা ভাস্কর্য ছিল কিনা তা দীর্ঘ আলোচনা ও পর্যালোচনার বিষয়। তাই মূর্তি/ভাস্কর্যের দ্ব্যর্থহীন, অকাট্য ও সর্বসম্মত বিধানের সঙ্গে খেলনা পুতুলের প্রসঙ্গ তোলা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অপ্রাসঙ্গিক। যদি সে পুতুলগুলো প্রকৃত অর্থে মূর্তি/ভাস্কর্যের অনুরূপ হয়েও থাকে; নির্ভরযোগ্য বক্তব্য অনুযায়ী ইসলামের শুরুর দিকে তার বৈধতা ছিল, পরবর্তীকালে তার বিধান রহিত হয়ে গেছে।
আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন,

قال: وذهب بعضهم الى أنه منسوخ وإليه مال ابن بطال... رجح الداودي أنه منسوخ، وقال المنذري: إن كانت اللعب كالصورة فهو قبل التحريم.

(অর্থ:) কাযী ইয়ায রহ. বলেছেন, কতক আলেমের মতে ছবি নিষিদ্ধের হাদীস দ্বারা (প্রাণীর আকৃতিতে তৈরী) খেলনা তৈরির বৈধতাও রহিত হয়ে গেছে। ইবনে বাত্তালের অভিমতও অনুরূপ...। ইমাম দাউদী রহ. রহিত হওয়ার মতকে প্রধান্য দিয়েছেন। ইমাম বায়হাকী রহ. প্রাণীর প্রতিকৃতি নিষিদ্ধতা সংক্রান্ত হাদীস উল্লেখের পর বলেন, এর মধ্যে প্রতিকৃতি রাখার নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হয়। সুতরাং হযরত আয়েশা রাযি.-এর ক্ষেত্রে এসবের ছাড় হারাম হওয়ার পূর্বে বলে ধরা হবে। ইবনুল জাওযী রহ. রহিত হওয়ার মতকে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত মনে করেন। ইমাম মুনযিরী রহ. বলেন, যদি (হাদীসে উল্লিখিত) খেলনা দ্বারা প্রাণীর আকৃতিতে তৈরী খেলনা উদ্দেশ্য হয় তবে (এর ব্যাখ্যা হল) এ ঘটনা হারাম হওয়ার পূর্বেকার, আর প্রাণীর আকৃতির না হয়ে থাকলে (এ হাদীসের ব্যাখ্যা হল,) প্রাণহীন বস্তুর আকৃতিকে লু'বা বা পুতুল বলা হয়েছে। আল্লামা হালীমী রহ. এ মতটিকে সঠিক মনে করেন। তিনি বলেন, খেলনা যদি মূর্তির/প্রাণীর আকৃতিতে হয় তাহলে তা জায়েয নেই, অন্যথায় জায়েয। (ফাতহুল বারী ১০/৬৪৬)

নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী সালাফের যুগে শিশুদের খেলনা পুতুল প্রাণীর প্রতিকৃতি ছিল না

শিশুদের খেলনা পুতুল সংক্রান্ত হাদীসের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের এক জামা'আতের বক্তব্য হলো– হযরত আয়েশা রাযি. যে পুতুলের কথা বলেছেন, তা দ্বারা হুবহু প্রাণীর আকৃতিতে তৈরি পুতুল উদ্দেশ্য নয় (বিশেষত বর্তমান বাজারে যে খেলনা পুতুল পাওয়া যায় তা তো অবশ্যই নয়)। এর দ্বারা উদ্দেশ্য এমন খেলনা পুতুল যা বাচ্চারা নিজেরা তৈরি করে, সেটাকে

কাপড় পরায় এবং 'বাবু' মনে করে খেলাধূলা করে। এই বক্তব্যটি আমাদের দৃষ্টিতে অধিক মজবুত।

আল্লামা কুরতুবী রহ. সহীহ বুখারী শরীফের হাদীসের শব্দ كنت العب بالبنات এর ব্যাখ্যায় বলেন,

وهن اللعب جمع لُعْبة وهو ما يُلْعَبُ به والبنات جمع بنت وهنَّ الجواري وأضيفت اللّعب للبنات لأنهنَّ هنَّ اللواتي يصنعنها ويلعبن بها.

(অর্থ:) 'লু'বা' বলা হয় ঐ জিনিসকে যারা দ্বারা খেলা হয়। হাদীসে বর্ণিত লু'বা শব্দটি 'বানাত' (বালিকা)-এর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে ব্যবহারের কারণ হলো, বালিকারা নিজ হাতে এ ধরনের খেলনা পুতুল তৈরি করে থাকে। অতঃপর এগুলো দ্বারা খেলাধূলা করে। (আলমুফহিম; হা.নং ৩২৩)

হযরত আয়েশা রাযি. এর বর্ণনায় স্পষ্টভাবে এ কথার উল্লেখ নেই যে, সেই খেলনাগুলো ছবি আকৃতির ছিল। আরবদেশে বাচ্চাদের খেলনা কেমন হয় তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শাইখ হামুদ বিন আব্দুল্লাহ তুআইজিরী বলেন,

بل والظاهر والله أعلم أنها كانت على نحو لعب بنات العرب في زماننا فإنهن يأخذن عودًا أو قصبة أو خرقة ملفوفة أو نحو ذلك فيضعن قريبًا من أعلاه عودا معترضًا ثم يلبسنه ثيابًا ويضعن على أعلاه نحو خمار المرأة وربما جعلته على هيئة الصبي في المهد ثم يلعبن بهذه اللعب ويسمينهن بنات لهن على وفق ما هو مروي عن عائشة وصواحباتها رضي الله عنهن.

وقد رأينا البنات يتوارثن اللعب بهذه اللعب اللاتي وصفنا زمانا بعد زمان ولا يبعد أن يكون هذا التوارث قديمًا ومستمرًا في بنات العرب من زمن الجاهلية إلى زماننا هذا والله أعلم.

(অর্থ:) 'বাস্তবতা তো আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। তবে বাহ্যিকভাবে মনে হয়, এই খেলনা দ্বারা আমাদের বর্তমান সময়ের মেয়েদের খেলনার মত খেলনা উদ্দেশ্য। বর্তমানের মেয়ে শিশুরা প্রথমে একটি (লম্বা) চটি, একটি (ছোট) কাঠি, গোল করে মোড়ানো একটি কাপড়ের পুটলি ও কিছু টুকরো কাপড় বা এ জাতীয় জিনিস সংগ্রহ করে। তারপর লম্বা চটিটির উপরের অংশের কাছাকাছি কাঠিটি আড়াআড়ি বাঁধে। এরপর এটার গায়ে কাপড় জড়িয়ে লম্বা চটির একেবারে মাথায় কাপড়ের পুটলিটি বেঁধে মেয়েদের ওড়না পরার মত আঁচল পরিয়ে দেয়। আবার কখনো দেখা যায়, দোলনায় বাচ্চার মত কিছু একটা বনিয়ে সেটা দিয়ে খেলা করে। তো এই জিনিসটিকে তারা بنات (কন্যা) মনে করে খেলে, ঠিক যেমনটি হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। আমরা আমাদের অঞ্চলের মেয়েদের দেখেছি যে, পূর্বে যে ধরনের খেলনার কথা বললাম তা যুগ যুগ ধরে পরম্পরায় চলে আসছে। এ কথা বললে বাড়াবাড়ি হবে না যে, এই পরম্পরার ব্যাপারটি আরবকন্যাদের মাঝে ইসলামের শুরু যুগ থেকে ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে।'

এরপর তিনি একটি বিষয় পরিষ্কার করেছেন যে, আরবের অনেক শিশু প্রাণীর আকৃতির পুতুল দ্বারা খেলে। তাহলে পূর্বোক্ত বক্তব্যের কী বাস্তবতা রইল? এর জবাবে তিনি বলেন,

وأما السالمات من أدناس المدنية الإفرنجية ومن مخالطة نساء الأعاجم وأشباه الأعاجم فهؤلاء لم يزلن على طريقة بنات العرب. ولعبهن على ما وصفنا من قبل.

(অর্থ:) যারা ইউরোপিয়ান কালচারের কলুষমুক্ত এবং অনারবীয়দের সংশ্রব ও সাদৃশ্যমুক্ত তারা পুতুল খেলায় এখনও (প্রাচীন) আরবকন্যাদের মতো। আর তাদের খেলনা পুতুল কেমন হয় তার বিবরণ আমি আগেই দিয়েছি। (ই'লানুন নাকীর আলাল মাফতূনীন বিত-তাসবীর ১/৬৭)

উল্লেখ্য, শাইখ বিন বায এবং শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফিফী উক্ত গ্রন্থের উপর প্রশংসাপত্র লিখেছেন।

আল্লামা কাশ্মীরী রহ. বলেন,

أن البنات جائزة، وكانت حقيقتها في القديم أنهم كانوا يأخذون ثوباً، ويشدونَه في الوسط، فكانت لا تحي عن صورة وشكل، ولم تكن كبناتنا اليوم، فإنَّها تماثيل كالأصنام، فلا تجوز قطعاً.

(অর্থ:) খেলনা পুতুল জায়েয। অতীতে এগুলো দ্বারা খেলার ধরন এই ছিল যে, তারা কাপড় সংগ্রহ করে এর মাঝখানে গিঁঠ দিতো। এ ধরনের খেলনা পুতুল (ছবির) আকার-আকৃতি বুঝায় না এবং তা আজকালের খেলনা পুতুলের মতও ছিল না। বর্তমানের খেলনা পুতুল তো প্রতিমা-মূর্তির মতো; নিশ্চিতভাবে তা জায়েয নেই। (ফয়যুল বারী ৭/৩৮৮)

সহীহ বুখারীর এ হাদীসটি উল্লিখিত বক্তব্যের সমর্থন করে। হযরত রবী বিনতে মুআওয়ায থেকে বর্ণিত,

... ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار.

(অর্থ:) ... আমাদের ছোট বাচ্চারা রোযা রাখতো। আমরা তাদের জন্য তুলার টুকরো দিয়ে খেলনা পুতুল বানাতাম। তাদের কেউ যখন খাওয়ার জন্য কান্নাকাটি করতো, আমরা এই ধরনের পুতুল দিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতাম। ইফতার পর্যন্ত এভাবে কেটে যেতো। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৯৬০)

আর আবূ দাঊদের হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক খেলনার ডানা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা প্রমাণ করে যে, এটা প্রকৃত অর্থে ছবি ছিল না। কারণ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেছেন, ওটা কি জিনিস? এটা বলেননি যে, ডানা কোত্থেকে এলো?

সারকথা, বাচ্চাদের খেলনা হিসেবে তৈরী প্রচলিত খেলনা পুতুল আর নববী যুগের খেলনা পুতুল এক নয়। (বর্তমানের প্রচলিত প্রাণীর আকৃতিবিশিষ্ট পুতুলকে হারাম বলা উচিত।) কারণ–

১. যে সকল হাদীসে খেলনা পুতুলের কথা বলা হয়েছে সেগুলোতে প্রাণীর আকৃতির কথা স্পষ্ট বুঝে আসে না। অথচ হারাম হওয়ার পক্ষের হাদীসগুলো স্পষ্ট।

২. আরবে ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী ঐতিহ্যবাহী পরিবারের বাচ্চাদের জন্য যে খেলনা পুতুলের প্রচলন আছে, তা বাস্তব প্রাণীর আকৃতির নয়; বরং তা বাচ্চাদের কাল্পনিক পুতুল হয়ে থাকে।

তবে এ কথা ঠিক যে, এ সংক্রান্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় উলামায়ে কেরামের মতবিরোধ থাকায় এর নিষিদ্ধতা অকাট্যভাবে হারাম প্রমাণিত মূর্তি/ভাস্কর্যের নিষিদ্ধতা থেকে তুলনামূলক হালকা হবে।

অপ্রাসঙ্গিক বিষয় টেনে এনে মূর্তি/ভাস্কর্য বৈধ করার প্রচেষ্টা দীন বিকৃতির নামান্তর

মূর্তি/ভাস্কর্যের নিষিদ্ধিতা অকাট্য ও উম্মতের ঐকমত্য দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত। এতদসত্ত্বেও যারা কুরআন-হাদীসের ভুল ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে তা বৈধ প্রমাণের চেষ্টা চালাচ্ছে। তাদের বিকৃত মস্তিষ্কের হাল-হাকীকত আল্লামা তাকী উসমানী দা.বা.-এর বক্তব্য থেকে উপলব্ধি করতে পারেন। তিনি বলেন, আপনি তাদের বক্তৃতা-বিবৃতিতে এ জাতীয় বাক্য বারবারই শুনে থাকবেন যে, আমরা কুরআন-সুন্নাহর এমন ব্যাখ্যা প্রদান করতে চাই, যাতে তা বর্তমান যুগের চাহিদা মোতাবেক হয়। এ বাক্যের সহজ সরল অর্থ এটাই যে, বর্তমান যুগে আমরা কুরআন-সুন্নাহর আসল বিধান কি তা অনুসন্ধান করতে যাব না, বরং প্রথমে নিজেরা স্থির করে নিব যে, যুগের চাহিদা কী? তারপর কুরআন-সুন্নাহর মাধ্যমে তার স্বপক্ষে দলীল খুঁজব। তা না পাওয়া গেলে আয়াত-হাদীসের এমন ব্যাখ্যা দান

করব, যাতে তা সমকালীন চাহিদা মোতাবেক হয়ে যায়।

আল্লামা তাকী উসমানী দা.বা. আরও বলেন, খৃস্টধর্ম প্রচারকগণ মুসলিম বিশ্বে তাদের ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে ঠিক এ নীতিই অবলম্বন করেছে। তারা সরলপ্রাণ মুসলিমদের ধোঁকা দেয়ার জন্য তাদের সামনে কুরআন-হাদীস দ্বারাই নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস প্রামাণ করে থাকে। যেমন তারা বলে, দেখো কুরআনেও হযরত ঈসাকে 'কালিমাতুল্লাহ' বলা হয়েছে, তার মানে তিনি আল্লাহর 'কালাম গুণ' ছিলেন। আর ইউহান্নার ইঞ্জিলেও একথা বলা হয়েছে। কুরআনেও তাকে রুহুল্লাহ বলা হয়েছে, এর দ্বারা বোঝা যায় হযরত ঈসা আল্লাহর রূহ ও আত্মা ছিলেন...।

এভাবে যে কুরআন দ্ব্যর্থহীনভাবে ত্রিত্ববাদকে খণ্ডন করেছে, তাদের নতুন ব্যাখ্যার বদৌলতে সেই কুরআন দ্বারাই মাথা-মুণ্ডহীন এ আকীদা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো। বাকী রইল সেই আয়াত, যা ত্রিত্ববাদকে সরাসরি খণ্ডন করেছে, তো সেটা কোন সমস্যা নয়, কেননা ত্রিত্ববাদকে যখন কুরআন দ্বারা প্রমাণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়া হয়েছে, এর ব্যাখ্যা দেয়া কঠিন কিছু নয়। (ইসলাম ও আমাদের জীবন: খ. ১৪ পৃ. ৬২)

কুরআন/হাদীস দ্বারা প্রণীর মূর্তি/ভাস্কর্য প্রমাণকারীদের অবস্থাও হুবহু অনুরূপ। নিষিদ্ধের ব্যাপারে যতোই অকাট্য প্রমাণ থাকুক, তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে, মূর্তি/ভাস্কর্য বৈধ প্রমাণ করবেই এবং নিষিদ্ধতা সংক্রান্ত সুস্পষ্ট আয়াত-হাদীসের অপব্যাখ্যায় নেমে পড়বে। অতএব মুসলিমদের উচিত এদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা; বরং হক্কানী উলামায়ে কেরামের কথা মেনে নেয়া। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে শিরকমুক্ত ঈমানের উপর অটল থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

লেখক: শিক্ষক; বাইতুল আমান মিনার মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, তাজমহল রোড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

(২৪ পৃষ্ঠার পর; কাদিয়ানী-আহমদিয়া জামাত)

চার.

ইসলাম: নবীজী আলাইহিস সাল্লামের উপর ঈমান আনার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সকল নবী থেকে ওয়াদা নিয়েছেন। (সূরা আলে ইমরান-৮১)

কাদিয়ানী: কাদিয়ানীর উপর ঈমান আনার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সকল নবী থেকে ওয়াদা নিয়েছেন। (কাদিয়ানী মাযহাব; পৃষ্ঠা ৩৪২)

পাঁচ.

ইসলাম: আল্লাহ তা'আলার কোন সন্তান নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। (সূরা ইখলাস)

কাদিয়ানী: কাদিয়ানী আল্লাহ তা'আলার সন্তানের ন্যায়। (কাদিয়ানীদের কিতাব-তাযকিরা; পৃষ্ঠা ৪১২)

ছয়.

ইসলাম: আল্লাহ তা'আলা কোনো মাখলুকের মত নন। (সূরা শূরা-১১)

কাদিয়ানী: কাদিয়ানী হলো আল্লাহ তা'আলার আত্মপ্রকাশ। (তাযকিরা; পৃষ্ঠা ৫৯৬)

সাত.

ইসলাম: ফাতহে মুবীন (মহা বিজয়) কাদিয়ানীকে নয় বরং নবীজীকেই দেয়া হয়েছিলো। (সূরা ফাতহ-১)

কাদিয়ানী: ফাতহে মুবীন (মহা বিজয়) কাদিয়ানীকে দেয়া হয়েছিলো, আর নবীজী আলাইহিস সালামকে দেয়া হয়েছিলো ছোট বিজয়। (কাদিয়ানীদের কিতাব- খুৎবায়ে ইলহামিয়া; পৃষ্ঠা ১৭৭)

আট.

ইসলাম: 'কুন ফায়াকুন'-এর মালিক কেবল আল্লাহ তা'আলাই। (সূরা ইয়াসীন-৮২)

কাদিয়ানী: কাদিয়ানী 'কুন ফায়াকুন'-এর মালিক। (কাদিয়ানীদের কিতাব-তাযকিরা; পৃষ্ঠা ৫২৫)

নয়.

ইসলাম: নাজাত ও মুক্তি কেবল নবীজীর অনুসরণের মধ্যে এবং তিনি যাদেরকে অনুসরণ করতে বলেছেন তাদের অনুসরণের মধ্যে। [কুরআন-সুন্নাহর কোথাও কাদিয়ানীকে অনুসরণ করতে বলা হয়নি।] (সূরা নিসা-৫৯)

কাদিয়ানী: নাজাতের ভিত্তি কেবল কাদিয়ানীর অনুসরণের মধ্যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামের অনুসরণের মধ্যে নয়। (কাদিয়ানীদের কিতাব; আরবাঈন; পৃষ্ঠা ৭)

দশ.

ইসলাম: কুরআন মাজীদ সর্বশেষ আসমানী কিতাব। (সূরা বাকারা-৪)

কাদিয়ানী: কুরআন নয়, বরং কাদিয়ানীর ওহীসমগ্র 'তাযকিরা'-ই সর্বশেষ আসমানী কিতাব।

(অবশিষ্ট দুই প্রশ্নের উত্তর আগামী সংখ্যায় ছাপা হবে ইনাশাআল্লাহ।)

(৩৩ পৃষ্ঠার পর; শ্রেষ্ঠ যিনি অন্দরে)

জগতের সকল নারীদের উপর আয়েশার শ্রেষ্ঠত্ব তেমনি, জগতের সকল খাদ্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব যেমন ছারীদের। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ৩২২৭৬)

বিবিদের সাথে যিনি এতোটা আন্তরিক। উদার চরিত্রের যিনি অনুপম উদাহরণ। মানুষ ও মনুষত্ব্যের, ইনসাফ ও মহব্বতের সবক যিনি শিখিয়ে চলছেন মহব্বতের রস মাখিয়ে। সেই মানুষটা পর্যন্ত আল্লাহর কাছে হাত তুলে ক্ষমা চাইতেন এই বলে, আয় আল্লাহ, যা আমার সাধ্যের ভিতর তাতে আমি ইনসাফ করতে ত্রুটি করিনি আর যা আমার সাধ্যের অতীত (কারো প্রতি অতি মহব্বত) সে বিষয়ে আমি আপনার কাছে ক্ষমাপ্রত্যাশী।

আমাদের নবীজী এমনই। নিষ্পাপ মাসুম হয়েও ক্ষমা প্রার্থনা করতে ভালোবাসতেন তিনি। উদার মনে ঘাতক দুশমনকেও মাফ করে দিতেন আপন করে। ভালোবাসার সুতোয় গাঁথা নবীজীর প্রিয় সংসারটাও এর ব্যতিক্রম ছিলো না। ঘরের বাইরের উদার মানুষটি অন্দরমহলে যে কতটা মহৎমানুষে পরিণত হতেন সেটা আমরা উপরের ঘটনাগুলো থেকেই জানতে পারি। কাউকে ভালোবাসা দেখাতে গিয়ে অন্যকে কষ্ট দেয়া ছিলো যেমন স্বভাববিরুদ্ধ। আখেরাত ভুলে দুনিয়া সঞ্চয়ের নিমগ্নতাও তেমনি ব্যথিত করে তুলতো নবীজীর হৃদয়কে। ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় নবীজীর অবিচলতা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একটি উদাহরণ। একজন সম্ভ্রান্ত নারীর চুরির অপরাধে হাত কর্তনের আইন কার্যকর করতে গিয়ে নবীজী দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছিলেন, আজ যদি আমার মেয়ে ফাতেমাও চুরি করতো, তবে আমি তার হাত কাটার নির্দেশ দিতাম। পৃথিবীর এই শ্রেষ্ঠ মানুষটিই জীবন সায়াহ্নে প্রদত্ত একখুৎবায় বলে গেলেন, ওহে জগতের মানুষ! আমি একজন মানুষমাত্র। আমার মনে হচ্ছে, অচিরেই আমার রবের তরফ থেকে ডাক চলে আসবে আর আমি তার ডাকে সাড়া দিয়ে আমার রবের সান্নিধ্যে চলে যাবো। মনে রেখো, আমি তোমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, এক হলো আল্লাহর কিতাব। এতে আছে সরল পথের দিশা ও নূর। তোমরা আল্লাহর কিতাবকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, আমার আহলে বাইত। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৪০৮)

লেখক: শিক্ষার্থী, ইফতা প্রথম বর্ষ, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া।

তাবলীগী বয়ান

১৯৮৮ ঈসায়ীতে কাকরাইল মসজিদে ঢাকার সমস্ত হালকার পুরানা সাথীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত

মুফতী যাইনুল আবেদীন রহ.-এর জরুরী বয়ান (শেষ অংশ)

বয়ান লেখক: প্রফেসর শেখ আবুল ক্বাসিম দা.বা.

পটভূমি: *তাবলীগ জামা'আতের বিশিষ্ট মুরুব্বী মুফতী যাইনুল আবেদীন ছাহেব রহ. ছিলেন তাবলীগের তিনও হযরতজীর নিবিড় সোহবতপ্রাপ্ত। ১৯৮৮ ঈসায়ীতে টঙ্গীতে অনুষ্ঠিত পুরানাদের দশদিনের জোড়ের পর ঢাকার সমস্ত হালকার পুরানা সাথীদেরকে কাকরাইলে জড়ো করা হয়েছিল। ১৫ অক্টোবর শনিবার বাদ মাগরিব (০৬:২৮-০৯:২২) এ সকল পুরানা সাথীর উদ্দেশে তিনি নিম্নলিখিত বয়ানটি পেশ করেন। কাকরাইলের বিশিষ্ট মুরুব্বী হাজী আব্দুল মুকীত সাহেব রহ.-এর বিশেষ নির্দেশনা ও তাগিদে আমি এটি কলমবন্দ করি। এ সময় আমি মুফতী ছাহেব রহ.-এর বাম হাঁটুসংলগ্ন বসা ছিলাম। আর হাজী ছাহেব রহ. উপবিষ্ট ছিলেন আমার ডানপাশে একেবারে গা-ঘেঁষে। বয়ান চলাকালীন বিদ্যুৎ চলে গেলে হাজী ছাহেব রহ. আমার খাতার উপর দীর্ঘসময় নিজ হাতে টর্চলাইট ধরে বয়ান লেখার কাজে সহায়তা করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সকলের কবরকে ঈমান ও আমলের নূরে আলোকিত রাখুন, তাবলীগ জামা'আতের বর্তমান সংকটে দিকনির্দেশনামূলক এই বয়ান পড়ে সবাইকে নেক ও এক হওয়ার তাওফীক দিন, কুরআন-সুন্নাহ-এ বর্ণিত মেযাজ ও রুচি অনুযায়ী তিন হযরতজীর বাতানো তারতীবে ইখলাস ও কুরবানীর সাথে দাওয়াতের মেহনত করার তাওফীক দিন এবং আমাকে, আমার পরিবার-পরিজন, পাঠকবৃন্দ ও তামাম উম্মতকে উভয় জগতে সত্যিকার কামিয়াবী নসীব করুন। আ-মীন। (বি.দ্র. পুরো বয়ানটি সঠিকভাবে বুঝার জন্য 'পরিশিষ্ট' শিরোনামে কিছু দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং সহজে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য পুরো বয়ানের সারমর্ম পয়েন্ট আকারে লিখে দেয়া হয়েছে।)*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর...)

বিবি ঘরে থাকতে বলে আর বাপ বাইরে যেতে বলে; কী করবেন বলুন? ভেবে জবাব দিন, ঘরে খবর চলে যাবে কিন্তু! জ্বী, বাপের কথাই শুনতে হবে। এই যে মুখে বললাম, বিবির কথার মোকাবেলায় বাপের কথা শুনতে হবে এটা প্রমাণ হবে কাজের দ্বারা। বাপের পক্ষ হতে বাইরে যাওয়ার নির্দেশ পাওয়ার পরও যদি ঘরেই বসে থাকি আর মুখে বলি যে, বাপের কথাই মানা উচিৎ তাহলে কাজে প্রমাণ হলো না। অনুরূপভাবে মেহনত ও কুরবানী করার সময় দেখতে হবে যে, কুরবানীটা দীনের জন্য করছি, নাকি নফসের জন্য। হ্যাঁ, দীনই এমন জিনিস যার জন্য সবকিছু কুরবান করা যায়। এজন্য নিজ নিজ হালকায় ভালো করে মেহনত করি। হালকাকে একত্রিত করে ছাত্র, মাস্তুরাত বিভিন্ন তবকায় কীভাবে কাজ করতে হয় খুলে খুলে বলি। কাকরাইলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাকাযা জানতে থাকি। কাকরাইল এবং পুরা দেশের মধ্যে মজবুত যোগাযোগ থাকতে হবে। রায়বেন্ড মারকাযে প্রতি মাসে সারা দেশের জোড় হয়– শুক্র, শনি ও রবিবার। আর ফয়সালাবাদের সাথীরা মঙ্গলবারে একত্রিত হয়। শুক্র, শনি ও রবিবারের জোড়ের তাকাযাগুলো মঙ্গলবারে ফয়সালাবাদের সাথীদেরকে গিয়ে শুনিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর মঙ্গলবারের মধ্যে তাকাযাগুলো সারা দেশে পৌঁছে যায়। এর ফলে রায়বেন্ডের তাকাযার উপর সারা দেশের কাম করনেওয়ালারা চিন্তা-ফিকির করে। ঠিক যেমন মুলকের ইজতেমা সারা দেশের মাথাব্যথা অর্থাৎ চিন্তা-ফিকিরের মাধ্যমে কামিয়াব হয়। অনুরূপভাবে আলমী ইজতেমা সারা আলমের মাথাব্যথার মাধ্যমে কামিয়াব হয়, শুধু মারকাযওয়ালা বা শুধু মুলকওয়ালাদের মাথাব্যথার দ্বারা হয় না। এজন্য আমি বলতে চাচ্ছি, সারা দেশ কাকরাইলের সঙ্গে মজবুত যোগাযোগ রাখুক, মারকাযওয়ালারা হালকাওয়ালাদের দেখভাল করুক। এতে সারা দেশে একই মানে এবং একই নিয়মে কাজ চলবে। অতঃপর সারা দেশের দশ কোটি মানুষের ফিকির অনুযায়ী হেদায়াতের ফায়সালা হবে।

যে পরিমাণ বলা হয় সে পরিমাণ কাজ করা দরকার। দেখেছেন কখনো, কোনো দোকান মাসে ৩ দিন খোলে অথবা সপ্তাহে ২ বেলা খোলে? না, সময় অনুযায়ী নিয়মিত খোলে। তেমনিভাবে মসজিদের কাজও রোজানা হতে হবে। অফিসের কাজ তো রোজানা আট ঘণ্টা করতে হয়। দীনের কাজ কি অফিসের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ? অতএব মসজিদের কাজে দৈনিক 'এক বাট্টা তিন' অর্থাৎ ৮ ঘণ্টা সময় লাগাতে হবে। তাহলে ইনশাআল্লাহ মহল্লার কাজ জমে উঠবে।

একজন মানুষের দৈনিক কতটুকু ঘুম দরকার? ৬ ঘণ্টা। আমিও বলি ৬ ঘণ্টা ঘুমান; এর চেয়ে কমালে তো সাথী 'অলি-আল্লাহ'! (মাথা খারাপ, অসুস্থ) হয়ে যেতে পারে! এরপর জরুরতে ২ ঘণ্টা, কৃষি-চাকুরী-ব্যবসা ইত্যাদিতে ৮ ঘণ্টা। এই হল ১৬ ঘণ্টা। বাকী থাকে ৮ ঘণ্টা। এই ৮ ঘণ্টা আমরা দীনের কাজে লাগাতে বলি। এক মজমাকে পুরো যিন্দেগীর তাশকীল করলাম, কিছু নাম আসল। এরপর আধা যিন্দেগীর তাশকীল করলাম, কিছু নাম আসল। সামনে এক সাথী বসা ছিল; দিলে দিলে চাচ্ছিলাম সেই সাথী নাম দিক। কিন্তু না দেয়ায় জিজ্ঞেস করলাম, তুমি নাম দিচ্ছো না কেন? বলল, আপনি দীন ও দুনিয়াকে সমপাল্লার করে ফেলেছেন, কীভাবে নাম দেই?! দীন তো দুনিয়ার চেয়ে বেশি দামী; কিন্তু আপনি মাত্র আধা যিন্দেগীর তাশকীল করলেন! বললাম, আচ্ছা ভাই ভুল হয়ে গেছে; আমি আমার ভুলের জন্য সবার সামনে তওবা করছি। এখন বলো, তুমি কীভাবে তাশকীল হতে চাও? সে বলল, দুই বাটা তিন অর্থাৎ বছরে ৮ মাস আল্লাহর রাস্তায় আর ৪ মাস জরুরতে।

এক মজমায় বিবাহের সুন্নাত তরীকা বলছিলাম। হযরত ফাতেমা রাযি. এবং হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি.-এর বিবাহের ঘটনা শোনালাম। তারপর বললাম, সুন্নাত তরীকায় বিবাহ সহজ না? সবাই জবাব দিল, জ্বী। জিজ্ঞেস করলাম, এমন সহজে বিবাহ করবে তো? জবাব দিল– বড্ড মুশকিল! জ্বী, আজ রেওয়াজ থাকায় কঠিন কাজ সহজ হয়ে গেছে, আর রেওয়াজ না থাকায় সহজ কাজ কঠিন হয়ে গেছে।

আগামী থেকে মজমায় বসার সময় এক-এক হালকার সাথীরা একসাথে বসব। যাতে কোন তাকাযা আসলে বসা অবস্থায় মশওয়ারা করে নেয়া যায়। এবার বলি, রোজানা ৮ ঘণ্টা সময় দিতে কে কে তৈরি আছি? সেইসঙ্গে পাক্কা আযম করে

নিই– প্রতি মাসে অবশ্যই ৩ দিন সময় লাগাবো; তবে একা নয়, দশ-দশজনকে সঙ্গে নিয়ে।

মাসিক ৩ দিন লাগানোর জন্য মাসের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ শুক্রবারের যে কোন এক শুক্রবারকে নির্দিষ্ট করে বের হওয়া। ফয়সালাবাদে একজন আমার কাছে এসে বলল, আপনাকে বিয়ে পড়াতে হবে শুক্রবারে। বললাম, আমি তো শুক্রবারে থাকব না; যদি আমাকে দিয়েই বিয়ে পড়াতে হয়, তারিখ পাল্টাতে হবে। সে বলল, মুফতী সাহেব! বিয়ের তারিখ তো পাল্টানো যায় না! জ্বী, এমনিভাবে মাসিক ৩ দিনের সপ্তাহও পাল্টানো যায় না। এজন্য নির্ধারণ করে নেয়া যে, প্রতি মাসে ৩ দিন বের হবো, নির্দিষ্ট সপ্তাহে বের হবো এবং ১০ জন নতুন সাথী নিয়ে বের হবো।

দেশবিভাগের আগে একবার জামা'আত থেকে নিযামুদ্দীন মারকাযে ফিরলাম। ইচ্ছা ছিল ওয়াপসী কথা শুনে এলাকায় ফিরে যাবো। হযরতজী ইলিয়াস রহ. বললেন, হযরত রায়পুরী রহ. (খাওয়াছদের) এক জামা'আত নিয়ে পাঞ্জাব যাচ্ছেন। আমার রায় হলো, তুমি সেই জামা'আতের সঙ্গে যাও। আমি তৈরি হয়ে গেলাম। এদিকে আমি এক মসজিদে জুমু'আর নামায পড়াতাম। এজন্য সাথীদের বলে দিলাম এক সপ্তাহের জন্যে ছুটি নিয়ে নিও। বেশি ছুটি নিলাম না, কারণ কতো দিনের জন্যে পাঠানো হচ্ছে জানি না। পরে দরকার হলে ছুটি বাড়িয়ে নিতে পারব। যাই হোক, হজরতজী বললেন, আজ মারকাযে থাকো, জামা'আত তৈরি হলে আগামীকাল যাবে। পরদিন হজরতজী বললেন, জামা'আত তো পুরা হয়নি তুমি বাড়িতে চলে যাও। নতুন এই আদেশ আমার কাছে ভারি মনে হলো। কেননা, ছুটির দরখাস্ত করে ফেলেছি, রাতেও থাকলাম, এখন বলা হচ্ছে যাওয়া লাগবে না! এদিকে বাড়ীর জন্যে ঔষধ কেনার দরকার ছিল। দিলদী থেকে ঔষধ সংগ্রহ করলাম, তারপর চলে যাওয়ার জন্যে মুসাফাহা করতে গেলাম। হজরতজী বললেন, থেকে যাও, জামা'আত পুরা হয় নাকি দেখে যাও। এবার তো আরও বোঝা মনে হলো। পরদিন দুপুরে বললেন, জামা'আত পুরা হয়নি চলে যাও। তাতে আমার উপর আরও চাপ পড়ল। বিকাল নাগাদ চলে যাওয়ার জন্যে যেই না মুসাফাহা করতে গিয়েছি, বললেন, আজ থেকে যাও, দেখা যাক জামা'আত পুরা হয় নাকি। আমার মাথায় যেন বাজ পড়ল। বিনা মুসাফাহায় চলে যেতে চাইলাম; আবার অনেক কষ্টে মনকে বুঝিয়ে থেকে গেলাম। পরদিন দুপুরে হজরতজী বললেন, জামা'আত পুরা হয়নি, চলে যাও। আবার বোঝা পড়ল। যা হোক, মুসাফাহা করে বিদায় নিলাম। দু'জন তালিবে ইলম আমাকে এগিয়ে দিল। দিলদী বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দিয়ে বললাম, যাও, গিয়ে পড়াশোনা করো। কিছুক্ষণের মধ্যে দু'জন তালিবে ইলম দৌড়ে এসে বলল, হজরতজী আপনাকে নিযামুদ্দীনে ফিরে যেতে বলেছেন। আমার তখনকার মনের অবস্থা আপনারা সহজেই অনুমান করতে পারছেন। একবার ভাবলাম জানিয়ে দেই যে, পরে দেখা করব; কিন্তু পারলাম না, অগত্যা নিযামুদ্দীনের দিকে রওয়ানা হলাম। আমার পা যেন চলেও চলছিল না। মারকাযে উঠতে সিঁড়ির আর দু'টি ধাপ বাকি। দ্বিতীয় ধাপে উঠে আমার চিন্তা আসল– আমীরের এতায়াতের হাকীকত কী? আমীর যদি ৫০ বারও 'যাও', 'আসো' বলে, মানা উচিৎ। তাহলে আমি কয়েকবারেই এতো বোঝা অনুভব করলাম কেন? ব্যস, আমার সমস্ত ক্ষোভ দূর হয়ে গেলো; অন্তরে অনাবিল প্রশান্তি অনুভব করলাম। জ্বী, বাপ কোথাও যেতে বললে ছেলের দৌড়ানো উচিৎ। দৌড় দেয়ার পর যদি বাপ মনে করে ফিরে আসা উচিৎ এবং ছেলেকে ফিরে আসতে বলে তাহলে ছেলের চলে আসা উচিৎ। যাই হোক, আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে হযরতজীর সামনে হাযির হয়ে সালাম দিলাম। হযরতজী মুসাফাহা করলেন। তারপর হেসে বললেন, এখন যাও বা থাকো তোমার ইচ্ছা। আমি দিল থেকে বললাম, এখন রাখেন বা পাঠিয়ে দেন আপনার ইচ্ছা। এই ঘটনা থেকে আমি বুঝতে পারলাম, আমার তরবিয়তের জন্য হযরতজী ইচ্ছা করেই এমনটি করেছেন। হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে এ কথার উপর বাইয়াত হয়েছিলেন যে, আপনাকে মেনে চলব, মনে চাক বা না চাক। এজন্য আমরা বড়'র সঙ্গে জুড়ে থাকব; বুঝে আসুক বা না আসুক।

অনুরূপভাবে আপোসেও জুড়ে থাকব। ছোটর সঙ্গেও জুড়ে থাকব। সাথীদেরকে মাখলুকের সঙ্গেও জুড়ে রাখা এবং খালেকের সঙ্গেও জুড়ে রাখা আমীরের দায়িত্ব। ইটে-ইটে জুড়লে দালান হয়। কাঠে-কাঠে জুড়লে জানালা হয়। উম্মত আপোসে না জুড়লে কিছু হয় না। জ্বী, জোড়ের দ্বারা সবকিছু হয়, বেজোড়ে (বিনা জোড়মিলে) কিছুই হয় না।

আর এক কথা মনে পড়ল– কাজকে নিজের কাজ মনে করে করি। কোন কারখানায় কিছু লোক জিনিস তৈরি করে, কিছু লোক তা চেক করে আর কিছু লোক সরবরাহ করে। এরা সবাই কর্মচারী। প্রত্যেক কর্মচারী নিজ নিজ শাখার কাজ ঠিকঠাক চলছে কিনা খেয়াল রাখে। কিন্তু যিনি কারখানার মালিক তিনি সকল শাখার ফিকির করেন, খেয়াল রাখেন। কারণ, তিনি কাজকে নিজের কাজ মনে করেন। একইভাবে দাওয়াতের কাজকে যখন নিজের কাজ বানিয়ে করব, গ্রাম ও শহরের সব তবকার ফিকির আমার দেমাগে থাকবে, দেশের ও দেশের বাইরের সারা আলমের ফিকির থাকবে।

আরেকটি কথা– শুধু কাম করনেওয়ালা না হই; কামকরানেওয়ালা হই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে কাম করানেওয়ালা বানিয়েছেন। হযরতজী ইলিয়াস রহ. ও ইউসুফ রহ. যদি শুধু কাম করনেওয়ালা হতেন কাজ এতোদূর পৌঁছতো না। যেহেতু তাঁরা কাম করানেওয়ালা বানিয়ে গেছেন এজন্য দেখুন, আজ ১২০ মুলকে কাম চলছে আলহামদুলিল্লাহ!

মনযূর নো'মানী রহ. বলেন, ইলিয়াস রহ. এক মূর্খ মেওয়াতীকে এমনভাবে বুঝাচ্ছিলেন যে, এই বয়ান মুফতী কেফায়াতুল্লাহ সাহেবকে সামনে রেখে হওয়া উচিৎ ছিলো। ইলিয়াস রহ. সেই মূর্খ মেওয়াতীকে এমনভাবে বুঝাচ্ছিলেন, যেন এই মেওয়াতী মেহনতে লেগে গেলে গোটা আলমে কাজ হবে। বস্তুত কাম করনেওয়ালা এক মজুরের কাম করে। পক্ষান্তরে কাম করানেওয়ালা দশ হাজারকে কাম করাতে পারে।

বেলাল পার্ক মসজিদে একজন বলছিল, মুফতী সাহেব বড় ভালো কথা বলেন কিন্তু ক্লান্ত করে ছাড়েন। আমি পেছনেই ছিলাম সে খেয়াল করেনি। আমি পেছন থেকে বললাম, মানুষ ক্লান্ত না হলে তো কাজ করে না। সে লজ্জা পেল, বলল, ঠিক।

এ ব্যাপারে মনজুর নোমানী সাহেব একটি ঘটনা শুনিয়েছেন। একবার হযরতজী ইলিয়াস রহ. এক জামা'আত নিয়ে মেওয়াতের এক গ্রামে যাচ্ছিলেন। ঐ জামা'আতে মনযূর নোমানী সাহেব স্বয়ং ছিলেন এবং মাযাহেরে উলূমের নাযেম আব্দুল লতীফ সাহেবও ছিলেন। জামা'আতের সাথীরা গরুর গাড়ি করে

যাচ্ছিলেন। পথে খুব বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তা কর্দমাক্ত হয়ে যায়। পথে একটা গরুর গাড়ি ভেঙ্গে যাওয়ায় ভাঙ্গা গাড়ির সামানাও জামা'আতের গরুর গাড়িতে উঠানো হয়। তাতে সাথীদের কষ্ট আরও বেড়ে যায়। সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত হয়ে যায়। হযরতজী সবাইকে উযূ করে নামাযের তৈরি নিতে বললেন। সবার ইচ্ছা, নামায পড়ে খাওয়া-দাওয়া করে বিশ্রাম নিতে হবে। হযরতজী সালাম ফিরিয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনারা মনে হয় জীবনে কোনদিন এতো ক্লান্ত হননি? সবাই একমত হলেন। তখন হযরতজী বললেন, একটু উপরের দিকে তাকান, সাহাবা রাযি. প্রতিদিন এরকম (বা এর চেয়ে বেশি) ক্লান্ত হতেন। আর আমরা জীবনে একবার (সে রকম) ক্লান্ত হতে পারলাম। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. ক্লান্ত হয়েছিলেন বলেই না আমরা দীন পেয়েছি। সাহাবা রাযি. তো রক্ত ঝরিয়ে ক্লান্ত হতেন, আর আমরা ঘাম ঝরিয়ে ক্লান্ত হতে তৈরি না হলে কিভাবে হবে? (দু'আ : ৯.১২-৯.২২)

পরিশিষ্ট: পুরো বয়ানটি ভালোভাবে বুঝার জন্য আহলুল্লাহ উলামায়ে কিরাম অথবা তিন চিল্লা দেয়া ফিকিরমান্দ সাথীর/ সাথীদের সাহায্য নেয়া জরুরী। এই বয়ান শুনেছেন এমন তিন চিল্লা দেয়া পুরানা সাথীর সামনে মুযাকারা হলে খুবই ভালো হয়। এই বয়ান পড়ার/ শোনার পর নিজেকে এবং সাথীদেরকে (এই বয়ানের ভিত্তিতে তামাম আলমে পুরোপুরি আমল যিন্দা করার জন্যে) রোজানা আট ঘণ্টা মসজিদের কাজে/ দাওয়াতের কাজে লাগাবার জন্যে তৈরি করে লিস্ট বানিয়ে সময় ও তারতীব ঠিক করা দরকার।

একনজরে পুরো বয়ানের সারমর্ম:

১. দাওয়াতের মেহনতের দ্বারা জীবনে পরিবর্তন আসে।

২. ঈমান ও নেক আমলের উপর পবিত্র ও সুখময় জীবনের ওয়াদা রয়েছে। অনুরূপভাবে ঈমান ও নেক আমলের উপর বান্দাকে তিনটি জিনিস দেয়া হবে– (১) মাহবূবিয়্যাত: বান্দা সকলের প্রিয়ভাজন হবে (২) মারযিয়্যাত: বান্দা সকলের কাঙ্ক্ষিত হবে। (৩) সুকূন: বান্দার পেরেশানীমুক্ত যিন্দেগী নসীব হবে।

৩. করার চেয়ে ছাড়া সহজ। যে আল্লাহর জন্য কোন কিছু ছাড়তে পারে না, সে আল্লাহর জন্য তা করতেও পারে না।

৪. বিবি-বাচ্চা তথা পরিবারের হক হলো, তাদেরকে নবীপরিবারের যিন্দেগীর মতো যিন্দেগী যাপন করানো। মূলত এটা শেখার উদ্দেশ্যেই কিছু সময়ের জন্য ঘর-পরিবার ছাড়তে বলা হয়। কেননা, আল্লাহর জন্য ছাড়তে না পারলে সহীহও করা যাবে না।

৫. তিনটি শর্ত পূরণ করা হলে দাওয়াতের মেহনতের দ্বারা পরিবর্তন আসবে– (১) সহীহ নিয়ত। (২) সহীহ তরীকা। (৩) মেহনতের পরিমাণ পূর্ণ করা।

৬. শুনে শুনে কোন কিছুতে পারদর্শী হওয়া যায় না। উদাহরণত শুনেশুনে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, দর্জি হওয়া যায় না। তদ্রুপ দাওয়াতের মেহনতও কাম করনেওয়ালার সাথে থেকে শিখতে হবে।

৭. মসজিদের কাজের উদ্দেশ্য হলো– মহল্লার শতভাগ নারী-পুরুষ যেন ঈমান, ইখলাস ও জরুরী ইলম শিখে এবং আখলাকওয়ালা হয়। এর জন্য ২৪ ঘণ্টা পালাবণ্টন করে মসজিদে মেহনত চালাতে হবে।

৮. নিয়তকে বড় করা, ছোট না করা।

৯. প্রতি ৩ চিল্লা দেয়া সাথী প্রতি মাসে নির্দিষ্ট সপ্তাহে ৩ দিনে যাওয়ার জন্য ১০ জন সাথী তৈরি করবেন।

১০. নিজের মধ্যে দীনের জন্য তাকাযা পয়দা করা। তাকাযা হলো, যা পুরা না করলে স্বস্তি হয় না। আর জরুরত হলো, যা না হলে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।

১১. দীনের কাজের উপর দুনিয়ার কাজকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা আসলে কোন জিনিসের উপর কোন জিনিসকে প্রাধান্য দিচ্ছি ভেবে দেখতে হবে।

১২. ভালো-মন্দ সকল হালতে মেহনতে লেগে থাকা।

১২. মনে রাখতে হবে, আমার কাছে দীনের যতোটুকু সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছেও আমার ততোটুকু সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে। এই মাপকাঠি দ্বারা নিজেকে মাঝেমধ্যে যাচাই করে নেয়া।

১৩. কাকরাইলের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা।

১৪. দীনের কাজে দৈনিক ৮ ঘণ্টা সময় দেয়া।

১৫. মাসিক ৩ দিনের সপ্তাহ পাল্টানো যায় না।

১৬. মনে চাক, না চাক শরীয়তের সীমার মধ্যে নিজের বড়কে মানতে থাকা।

১৭. আপোসে জোড়মিল বজায় রাখা।

১৮. দীনের কাজকে নিজের কাজ মনে করে করা ।

১৯. শুধু কাম করনেওয়ালা না, কাম করানেওয়ালা হই ।

২০. মানুষ ক্লান্ত না হলে কাজ করে না।

২১. সাহাবা রাযি. দৈনিক ক্লান্ত হতেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বয়ানটি সহীহভাবে বুঝে এবং আমল করে উভয় জাহানে কামিয়াব হওয়ার তাওফীক দান করুন। **আমীন।**

[বি.দ্র. আয়াত-হাদীসসমূহের ইবারাত-হাওয়ালাহ অক্ষরবিন্যাসকারী কর্তৃক সংযোজিত ও অনূদিত। অক্ষরবিন্যাস-কারী: জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ায় ২০০২, ২০১২ ও ২০১৪ ঈসায়ীতে যথাক্রমে হিফয, দাওরা ও ইফতা সমাপনকারী মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন ক্বাসিম (বয়ান লেখকের মেজো সাহেবযাদা)]

(৭ পৃষ্ঠার পর; তাবলীগের ছয় উসূল)

তোমরা আল্লাহ ও তাঁরা রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটা তোমাদের জন্য শ্রেয়– যদি তোমরা উপলব্ধি করো। (সূরা ছফ-১০, ১১)

ব্যবসায়ীদেরকে দেখবেন, এক-একজন ক্রেতাকে তারা দশ-বিশটা কাপড় দেখাচ্ছে কিন্তু বিরক্ত হচ্ছে না, উপরন্তু চা-কফি, কোমল পানীয় দ্বারা আপ্যায়ন করছে। আয়াতে কারীমায় ইঙ্গিত রয়েছে, যিনি দীনের কাজ করবেন তাকেও ব্যবসায়ীদের মতো সহনশীল মেজাযের অধিকারী হতে হবে এবং উগ্রপন্থা অবলম্বন করা যাবে না। প্রথম প্রথম হয়তো মানুষ তার কথা শুনতে চাইবে না, তারপরও তাকে বলতেই থাকতে হবে; বিরক্ত হলে চলবে না। এরপর একসময় দেখা যাবে, মানুষ তার কথা আগ্রহ নিয়ে শুনবে, সে যা বলবে মানার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে।

অনুরূপভাবে দাঈর জন্য নিজেকে উপস্থাপন করার চেয়ে আল্লাহর দীন উপস্থানের প্রতি নজর দিতে হবে। নিজেকে উপস্থাপনের মানসিকতা তো সরাসরি রিয়া ও লোকদেখানো কাজ। এটা দীনের দাওয়াতকে বে-আছর করে দেয় এমনকি অনেক সময় বদ-আছর সৃষ্টি করে।

মুহতারাম দোস্তো, বুযুর্গো!

এতক্ষণ যাবৎ আমি দাওয়াত ও তাবলীগের ছয় উসূলের অভ্যন্তরীণ কিছু বিষয়ে সামান্য ইঙ্গিত করেছি– আশা করি আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি। ছয় উসূলের বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমরা উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে জেনে জেনে সে অনুযায়ী আমল করবো। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ভরপুর তাওফীক দান করুন। আমীন।

অনুলিখন: মাওলানা শফীক সালমান কাশিয়ানী
শিক্ষক: জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া,
খতীব: শাহীনবাগ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ,
তেজগাঁও, ঢাকা।

ইসলামের শাশ্বত বিশ্বাস 'খতমে নবুওয়্যাত' অস্বীকারকারী 'কাদিয়ানী-আহমদিয়া জামাত' সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

ফাতাওয়া বিভাগ: জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

আমরা সকল মুসলমান জানি এবং বিশ্বাস পোষণ করি যে, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল; তাঁর পরে আর কোন নবীর আগমন ঘটবে না। ইসলামী শরীয়তে বিষয়টিকে 'আকীদায়ে খতমে নবুওয়্যাত' বলে উল্লেখ করা হয় এবং এটি দীনের অপরিহার্য একটি আকীদা বা বিশ্বাস। খতমে নবুওয়্যাত অস্বীকার করলে ঈমান থাকে না।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, 'কাদিয়ানী-আহমদিয়া জামাত' নামে একটা গোষ্ঠী 'খতমে নবুওয়্যাতের আকীদা' অস্বীকার করা সত্ত্বেও নিজেদেরকে 'মুসলিম জামাত' বলে অপপ্রচার চালাচ্ছে। এরা মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর অনুসারী, যে কিনা নিজেকে ইমাম মাহদী, ঈসা-মসীহ এমনকি নবী বলেও দাবী করেছে। অনুরূপভাবে এই কাদিয়ানী-আহমদিয়া জামাত ইসলামের স্বকীয়তাজ্ঞাপক পরিভাষা যথা: 'ইসলাম', 'মুসলিম', 'মসজিদ', 'উম্মুল মু'মিনীন', 'সাহাবী', 'কালিমা তায়্যিবা', প্রভৃতি ব্যবহার করে সহজ-সরল মুসলমানদেরকে প্রতারিত ও বিভ্রান্ত করে মুসলমানদের ঈমান ও আমল বরবাদ করার জঘন্য চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে।

এমতাবস্থায় মুসলমান ভাই-বোনদের বিশুদ্ধ আকীদা এবং সহীহ ঈমান-আমল হেফাযত করার লক্ষ্যে 'খতমে নবুওয়্যাতের আকীদা' বিষয়ক সুস্পষ্ট বিবরণ জাতির সামনে তুলে ধরে 'কাদিয়ানী আহমদিয়া-মুসলিম জামাতে'র ধোঁকাবাজি ও প্রতারণার বিষয়টি সকলের কাছে পরিষ্কার করা অত্যন্ত জরুরী। এ উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রশ্নের দলীলসহ জবাব প্রদান করে মুসলিম উম্মাহর ঈমান-আমল সংরক্ষণে আপনাদের বলিষ্ঠ রাহনুমায়ী প্রত্যাশা করছি।

প্রশ্নগুলো এই–

এক. 'খতমে নবুওয়্যাত' সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের বক্তব্য কী?

দুই. কাদিয়ানী ধর্মমত ও ইসলামের মাঝে পার্থক্য কী?

তিন. কাদিয়ানী ধর্মমতের অনুসারীদের সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের বিধান কী?

চার. কাদিয়ানীরা কি নিজেদের দাওয়াতী কর্মকাণ্ডে ও লেখা-লেখনীতে 'ইসলাম', 'মুসলিম', 'মসজিদ', 'উম্মুল মু'মিনীন', 'সাহাবী', 'কালেমা তায়্যিবা' প্রভৃতি পরিভাষাসমূহ ব্যবহার করার অধিকার রাখে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর :

'খতমে নবুওয়্যাত'-এর অর্থ হলো– হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁর মাধ্যমে নবুওয়্যাতের ধারাবাহিকতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তাঁর পরে নতুন করে আর কেউ নবী বা রাসূল হবে না।

'খতমে নবুওয়্যাত' এটি ইসলামী শরীয়তের একটি মৌলিক আকীদা বা শাশ্বত বিশ্বাস। এই আকীদাটি শরীয়তের দলীল চতুষ্টয় তথা 'কুরআন', 'সুন্নাহ', 'ইজমায়ে উম্মত' এবং 'কিয়াস' দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। এ আকীদা-বিশ্বাসের অস্বীকারকারীর কাফের হওয়ার ব্যাপারে সর্বকালের সকল হক্কানী উলামায়ে কেরামের ঐকমত্য সুপ্রতিষ্ঠিত।

কুরআনে কারীমের আলোকে 'খতমে নবুওয়্যাত':

কুরআন মাজীদের প্রায় শতাধিক আয়াত দ্বারা 'আকীদায়ে খতমে নবুওয়্যাত' প্রমাণিত। তন্মধ্যে কয়েকটি আয়াত এই–

আয়াত নং-১

ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.

(অর্থ:) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে কারো পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহ তা'আলার রাসূল এবং **খাতামুন্নাবিয়্যীন**। (সূরা আহযাব-৪০)

'খাতামুন্নাবিয়্যীন'-এর ব্যাখ্যা:

আয়াতে কারীমায় উল্লিখিত خاتم শব্দটি দুইভাবে পাঠ করা যায়। (ক) 'তা' অক্ষরটি যবরযুক্ত করে। (খ) 'তা' অক্ষরটি যেরযুক্ত করে। এই خاتم শব্দের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যদি কুরআনে পাকের অন্যান্য আয়াত, হাদীস শরীফের সুস্পষ্ট বর্ণনা, সাহাবায়ে কেরামের তাফসীর এবং আইম্মায়ে সালাফের ব্যাখ্য ও ভাষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে শুধু আরবী আভিধানিক বিশ্লেষণের উপরও ছেড়ে দেয়া হয়, তবুও উভয় পাঠপদ্ধতি অনুযায়ী خاتم শব্দের আভিধানিক বিশ্লেষণের সারাংশ এটাই দাঁড়ায় যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বশেষ নবী, তাঁর পর আর কেউ নবী হবে না।

خاتم শব্দের আভিধানিক অর্থ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কিছু গ্রন্থের বক্তব্য দেখুন

ইমাম রাগেব ইস্‌পাহানী রহ. (মৃ. ৫০২হি.) বলেন–

وخاتم النبيين لأنه ختم النبوة اى تتمها بمجيئه.

অর্থাৎ, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এজন্য খাতামুন্নাবিয়্যীন বলা হয় যে, তিনিই নবুওয়্যাতের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন অর্থাৎ তিনি স্বীয় আগমনের মাধ্যমে নবুওয়্যাতের ধারা পূর্ণ করেছেন। (মুফরাদাতুল কুরআন; পৃষ্ঠা ১৪২)

আরব-আজম সকলের নিকট সমাদৃত ও সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য আরবী অভিধান 'লিসানুল আরব' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে–

وختام القوم وخاتمهم: آخرهم؛ عن اللحياني؛ ومحمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء، عليه وعليهم الصلاة والسلام.

অর্থাৎ, লিহয়ানী থেকে বর্ণিত আছে যে, যবরযুক্ত হোক বা যেরযুক্ত উভয় অবস্থাতেই خاتم শব্দের অর্থ হবে দল বা জাতির সর্বশেষ ব্যক্তি। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'খাতামুল আম্বিয়া' তথা (নবী হিসেবে আগমনকারী) সর্বশেষ নবী। (লিসানুল আরব ১২/১৬৪)

হাদীসের শব্দসমূহের গ্রহণযোগ্য বিশ্লেষণ সংবলিত লুগাতে হাদীস-এর অনবদ্য গ্রন্থ 'মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার'-এ উল্লেখ রয়েছে–

الخاتم و الخاتم من أسمائه صلى الله عليه و سلم، بالفتح إسم أى آخرهم، و بالكسر إسم فاعل.

অর্থাৎ, خاتم শব্দটির 'তা' হরফটি যবরযুক্ত হোক বা যেরযুক্ত উভয় অবস্থাতেই এটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম। 'তা'

হরফটি যবরযুক্ত হলে এটি হবে ইস্‌ম বা বিশেষ্য, যার অর্থ সর্বশেষ। আর 'তা' হরফটি যেরযুক্ত হলে এটি হবে ইসমে ফায়েল বা কর্তা, যার অর্থ পরিসমাপ্তকারী। (মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার ২/১১)

বিখ্যাত মুফাসসির আল্লামা আলূসী বাগদাদী রহ. (মৃ. ১২৭০হি.) লিখেছেন–

والخاتم اسم آلة لما يختم به كالطابع لما يطبع به فمعنى خاتم النبيين الذي ختم النبيون به ومآله آخر النبيين.

অর্থাৎ, خاتم ('তা যবরযুক্ত') শব্দটি এমন জিনিসের নাম যার দ্বারা মহর লাগানো হয় বা সমাপ্ত করা হয়, যেমন طابع এমন জিনিস যার মাধ্যমে সীল লাগানো হয়। সুতরাং 'খাতামুন্নাবিয়্যীন' এর অর্থ হবে– ঐ ব্যক্তি যার মাধ্যমে নবুওয়্যাতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। ফলে তিনি হলেন সর্বশেষ নবী।

তিনি আরো লিখেছেন–

والمراد بكونه عليه الصلاة والسلام خاتمهم انقطاع حدوث وصف النبوة في أحد من الثقلين بعد تحليه عليه الصلاة والسلام بها في هذه النشأة،

অর্থাৎ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাতামুন্নাবিয়্যীন হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল– নবীজীর নবুওয়্যাতের গুণে গুণান্বিত (তথা নবী) হওয়ার পর জ্বিন ও ইনসানের মধ্য থেকে কারো জন্য এই গুণে গুণান্বিত (তথা নবী) হওয়ার সুযোগ সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে গেছে। (রূহুল মা'আনী ১১/২১৩)

আল্লামা আহমাদ মোল্লা জিউন রহ. خاتم শব্দের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন–

والمآل على كل توجيه هو المعنى الآخر، ولذلك فسر صاحب المدارك قراءة عاصم بالآخر وصاحب البيضاوى كل القراءتين بالآخر.

অর্থাৎ, (ت যবরযুক্ত হোক বা যেরযুক্ত) উভয় অবস্থাতেই خاتم শব্দের অর্থ হবে সর্বশেষ। আর একারণেই তাফসীরে মাদারেক-এর গ্রন্থকার, আসেম রহ.-এর ক্বিরা'আত (অর্থাৎ خاتم যবরযুক্ত) এর তাফসীর آخر তথা 'সর্বশেষ' দ্বারা করেছেন। আর আল্লামা বায়যাবী রহ. (خاتم যবর এবং যেরযুক্ত) উভয় ক্বিরাত (পাঠরীতি)-এর এই একটাই তাফসীর করেছেন। (অর্থাৎ آخر তথা 'সর্বশেষ')। (তাফসীরে আহমাদী)

সীরাতের বিখ্যাত কিতাব 'আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ' আল্লামা যারক্বানী রহ. (মৃ. ১১২২হি.) লিখেছেন–

ومنها: أنه خاتم الأنبياء والمرسلين" كما قال تعالى: وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، أي: آخرهم الذي ختمهم أوختموا به على قراءة عاصم بالفتح، وروى أحمد[١] والترمذي[٢] والحاكم[٣] بإسناد صحيح عن أنس مرفوعًا: "إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي"،

অর্থাৎ, নবীজী আলাইহিস সালামের বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্য থেকে এটিও একটি যে, তিনি সর্বশেষ নবী ও রাসূল; যেমনটি আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ যার মর্ম হলো, 'সর্বশেষ নবী' যিনি নবীদের ধারাবাহিকতা পরিসমাপ্ত করেছেন, অথবা আসেম রহ. এর ক্বিরাত অনুযায়ী ت যবরযুক্ত পড়লে উদ্দেশ্য হবে, ঐ নবী যার আগমনের মাধ্যমে নবীদের ধারাবাহিকতা পরিসমাপ্ত করা হয়েছে। আর ইমাম আহমাদ, তিরমিযী এবং হাকেম রহ. বিশুদ্ধ সূত্রে হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, নবীজী আলাইহিস সালাম বলেছেন– নবুওয়্যাত ও রিসালাতের ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে গেছে। আমার পরে না কোনো রাসূল আছে, না কোনো নবী। (শরহুয যারক্বানী ৭/২৩৫)

আয়াত নং-২

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا

(অর্থ:) আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য দীন হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করলাম। (সূরা মায়িদাহ-৩)

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে–

عن ابن عباس رضى الله عنه قال لم يترل بعد هذه الآية حلال ولا حرام ولا شيئ من الفرائض والسنن والحدود والأحكام

অর্থাৎ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, এই আয়াত নাযিল হওয়ার পরে হালাল-হারাম, ফরয-সুন্নাত, দণ্ডবিধি বা হুকুম-আহকাম সম্পর্কিত আর কোনো আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। (তাফসীরে মাযহারী ২/২৭২)

কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী রহ. লিখেছেন– এই আয়াত বিদায় হজ্জের সময় শুক্রবার আরাফার দিন অবতীর্ণ হয়। এরপর নবীজী আলাইহিস সালাম ৮১ দিন জীবিত ছিলেন। তবে এই ৮১ দিনের মধ্যে হুকুম আহকাম সম্পর্কিত আর কোন আয়াত নাযিল হয়নি।[৪] এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে একথা প্রমাণিত হয় যে, দীনে ইসলাম পরিপূর্ণ ও মুকাম্মাল হয়ে গেছে। বিদায় হজ্জের থেকে আজ পর্যন্ত না কোনো আহকামের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, আর না কিয়ামতের আগ পর্যন্ত হবে, আর না তার কোনো প্রয়োজন রয়েছে।

আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী রহ. (মৃ. ৬০৬হি.) উক্ত আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন–

الثالث: وهو الذي ذكره القفال وهو المختار: أن الدين ما كان ناقصا البتة، بل كان أبدا كاملا، يعني كانت الشرائع النازلة من عند الله في كل وقت كافية في ذلك الوقت، إلا أنه تعالى كان عالما في أول وقت المبعث بأن ما هو كامل في هذا اليوم ليس بكامل في الغد ولا صلاح فيه، فلا جرم كان ينسخ بعد الثبوت وكان يزيد بعد العدم، وأما في آخر زمان المبعث فأنزل الله شريعة كاملة وحكم ببقائها إلى يوم القيامة، فالشرع أبدا كان كاملا، إلا أن الأول كمال إلى زمان مخصوص، والثاني كمال إلى يوم القيامة فلأجل هذا المعنى قال: اليوم أكملت لكم دينكم.

অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত দীনে ইসলামকে পরিপূর্ণ বললে এই সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে যে, 'তবে কি পূর্বেকার নবীদের আনীত দীন অসম্পূর্ণ ছিল?' তারই ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা রাযী রহ. তিনটি মত উল্লেখ করেছেন এবং তৃতীয় মতকে সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য বলে ব্যক্ত করেছেন; তা হলো–

'পূর্বেকার কোনো দীনে ইলাহী কখনো অসম্পূর্ণ ছিল না, বরং প্রত্যেক দীনই নিজ নিজ যুগ অনুযায়ী পরিপূর্ণ এবং যথেষ্ট ছিল, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পূর্ব থেকেই জানতেন যে, যে দীন আজ পরিপূর্ণ এবং যথেষ্ট, কাল তা যথেষ্ট এবং কল্যাণকর থাকবে না। আর তাই নির্দিষ্ট

---

(١) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (رقم ١٣٨٢٤) بلفظ– ... عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي"، قال: فشق ذلك على الناس، قال: قال: "ولكن المبشرات"، قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: "رؤيا الرجل المسلم، وهي جزء من أجزاء النبوة"

وقال المحقق شعيب الأرنؤوط فى تعليقه: إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير المختار بن فلفل، فمن رجال مسلم.

(٢) والترمذي فى سننه (رقم ٢٢٧٢)

وقال: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه من حديث المختار بن فلفل.

(٣) والحاكم فى المستدرك على الصحيحين (رقم ٨١٧٨)

وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم و لم يخرجاه

وقال الذهبى فى تلخيصه: (هذا الحديث) على شرط مسلم

(٤) التفسير المظهرى ٢٧٣/٢ ط د.ك.ع.

সময় অতিক্রম করার পর (পরবর্তী দীনের মাধ্যমে) পূর্ববর্তী দীনকে রহিত করে দিতেন। কিন্তু নবুওয়্যাতের শেষ যুগে আল্লাহ তা'আলা এমন এক স্বয়ংসম্পূর্ণ দীন প্রদান করলেন, যা সকল যুগের জন্য পরিপূর্ণরূপে উপযোগী এবং এই দীনকেই কিয়ামত পর্যন্ত বহাল রাখার ব্যাপারে হুকুম জারী করলেন।

মোটকথা হল, পূর্বেকার শরীয়তও পূর্ণ ছিল, তবে তা ছিল একটা সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য। আর এই শরীয়তে মুহাম্মাদী কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য পরিপূর্ণ এবং যথেষ্ট। একথা বুঝানোর জন্যই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– اليوم أكملت لكم دينكم অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম।' (তাফসীরে কাবীর **১১/২৮৭**)

সুতরাং নবীজী আলাইহিস সালামের ওফাতের পর থেকে আজ পর্যন্ত যেহেতু কোনো হুকুম-আহকাম অবতীর্ণ হয়নি এবং কিয়ামতের আগে হবেও না, কাজেই নতুন করে কোনো নবী আগমনের প্রশ্নও ওঠে না।

আয়াত নং-৩

قل ياأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض

অর্থ: হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি বলে দিন হে লোকসকল! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি, যিনি সমগ্র আসমান যমিনের অধিপতি। (সূরা আ'রাফ-১৫৮)

উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইবনে কাসীর রহ. (মৃ. ৭৭৪হি.) উল্লেখ করেন–

يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم {قل} يا محمد: {يا أيها الناس} وهذا خطاب للأحمر والأسود، والعربي والعجمي، {إني رسول الله إليكم جميعا} أي: جميعكم، وهذا من شرفه وعظمته أنه خاتم النبيين، وأنه مبعوث إلى الناس كافة، كما قال تعالى: {قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ} [الأنعام:١٩] وقال تعالى: {ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده} [هود:١٧] وقال تعالى: {وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ} [آل عمران:٢٠] والآيات في هذا كثيرة، كما أن الأحاديث في هذا أكثر من أن تحصر، وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة أنه، صلوات الله وسلامه عليه، رسول الله إلى الناس كلهم.

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীকে বলছেন, আপনি সাদা-কালো, আরব-অনারব সকলকে সম্বোধন করে বলে দিন যে, আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি। আর নবীজী আলাইহিস সালামের সম্মান ও গুণাবলীর মধ্য থেকে এটিও একটি যে, তিনি খাতামুন্নাবিয়্যীন এবং তিনি নির্দিষ্ট কোন কওম বা জাতি-গোষ্ঠীর নবী নন বরং তিনি সমগ্র জগৎবাসীর নবী। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা নিজেই কুরআনে হাকীমে বলেছেন–...قل الله شهيد بيني وبينكم (অর্থ:) হে নবী! আপনি বলুন আমার এবং তোমাদের মাঝে সাক্ষী হলেন আল্লাহ। আর এই কুরআন ওহীযোগে আমার নিকটে প্রেরণ করা হয়েছে যাতে আমি তোমাদেরকে ভয় দেখাই, সতর্ক করি। (সূরা আনআম-১৯) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন– ومن يكفر به من الأحزاب..... (অর্থ:) আর যে কেউ এই নবীকে অস্বীকার করবে জাহান্নামই তার ঠিকানা হবে। (সূরা হুদ-১৭) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন– وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين... (অর্থ:) হে নবী! আপনি আহলে কিতাব এবং উম্মীদেরকে বলুন 'তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করেছো?' যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তবে হেদায়েত পাবে। আর যদি তারা (ইসলাম গ্রহণ না করে আপনাকে) পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে তাহলে আপনি পেরেশান হবেন না, আপনার দায়িত্ব তো কেবল পৌঁছানো। (সূরা আলে ইমরান-২০) মোটকথা নবীজী আলাইহিস সালাম যে সমগ্র জগৎবাসীর জন্য নবী ছিলেন, সে সম্পর্কে কুরআন মাজীদে আরো বহু আয়াত রয়েছে। (বোঝার জন্য মাত্র কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো) এবং এ ব্যাপারে অসংখ্য হাদীসও বর্ণিত রয়েছে। আর এই কয়টি আয়াতেই বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় প্রত্যুজ্জল ও সুস্পষ্ট হয় যে, দীনে ইসলামের অবশ্যমান্য বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত আকীদা হলো, নবী আলাইহিস সালাম সকলের নবী। (কেউ এর থেকে ব্যতিক্রম নয়।) (তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩/৪৮৯)

আয়াত নং-৪

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا

(অর্থ:) পূত ও পবিত্র ঐ সত্তা যিনি ফুরকান (তথা কুরআন) স্বীয় বান্দা (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর নাযিল করেছেন যাতে তিনি সমগ্র জাহানের অধিবাসীদেরকে আল্লাহ তা'আলার আযাবের ভয় দেখান। (সূরা ফুরকান-১)

আয়াত নং-৫ وأرسلناك للناس رسولا

(অর্থ:) আর (হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!) আমি (আল্লাহ) আপনাকে গোটা মানবগোষ্ঠীর জন্য রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি। (সূরা নিসা-৭৯)

উল্লিখিত আয়াতগুলো দ্বারা একথা স্পষ্ট হয় যে, নবীজী আলাইহিস সালাম পূর্ব-পশ্চিম, আরব-আজম সকলের নবী। চাই সে নবীজীর যুগে জন্মগ্রহণ করুক বা নবীজীর ইন্তেকালের পর কিয়ামতের পূর্বে জন্ম গ্রহণ করুক। নবীজী আলাইহিস সালামের হাদীস থেকেও বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। তিনি বলেন–

عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا رسول من ادركت حيا ومن يولد بعدى،

অর্থাৎ যাদেরকে আমি আমার জীবদ্দশায় জীবিত পেয়েছি আমি তাদের রাসূল এবং যারা আমার মৃত্যুর পরে কিয়ামতের আগ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করবে তাদেরও রাসূল। (আত-তাবাকাতুল কুবরা ১/১৫০)

তো যখন নবী আলাইহিস সালামের আগমনের পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী সকল মানুষ তাঁরই উম্মত এবং নবুওয়্যাতের এই ব্যাপকতা নবীজীর এমন এক বৈশিষ্ট্য যা অন্যান্য নবীদের থেকে নবীজীকে আলাদা করে দেয়, তখন নবীজীর পরে অন্য কেউ নতুন করে নবী হলে নবীজীর এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য আর বাকী থাকবে না, যে বৈশিষ্ট্যের কথা নবীজী নিজেই বর্ণনা করেছেন।[৫] সুতরাং আল্লাহ তা'আলা নবীজীকে যে মর্যাদায় ভূষিত করেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে; এর ব্যতিক্রম কল্পনাও করা যায় না।

সারকথা, 'খাতামুন্নাবী' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী। তাঁর মাধ্যমে নবুওয়্যাতের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। তাঁর পরে নতুন করে আর কেউ নবী হবে না। কাজেই আখেরী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে 'বুরূজী নবী', 'যিল্লী নবী', 'শরীয়তবিহীন নবী', 'উম্মতী নবী' বা যে কোনো ধরনের নামধারী নবীই মিথ্যাবাদী ও ভণ্ড বিবেচিত হবে।

---

(٥) عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة (صحيح البخارى-٤٣٨)

হাদীসে পাকের আলোকে 'খতমে নবুওয়্যাত':

হাদীসে নববীর ভাণ্ডারে 'আকীদায়ে খতমে নবুওয়্যাত' সম্পর্কে এই পরিমাণ বর্ণনা রয়েছে, যার সবগুলো এ ছোট পরিসরে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তবে 'আকীদায়ে খতমে নবুওয়্যাত' সম্পর্কে হাদীসে নববীর এই বিশাল ভাণ্ডার দেখে একথা অবশ্যই মানতে হয় যে, এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস **'মুতাওয়াতির'** পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ খতমে নবুওয়্যাতের বর্ণনা সংবলিত হাদীসসমূহ নবীজীর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে এতো পরিমাণ লোক বর্ণনা করে আসছে যে, এতগুলো লোক একসাথে মিথ্যা বলতে পারে এটা কোনো সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি বিশ্বাস করবে না। আইনী দৃষ্টিকোন থেকে এ ধরনের হাদীসের উপর ঈমান রাখা তেমনই ফরয যেমন কুরআনের উপর ঈমান রাখা ফরয।

এখানে আকীদায়ে খতমে নবুওয়্যাত বিষয়ে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো:

হাদীস নং-১

عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة

(অর্থ:) হযরত জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দান করা হয়েছে যা পূর্ববর্তী কোনো নবীকে দেয়া হয়নি। এগুলোর অন্যতম হল– আমি সমগ্র জাহানের নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৪৩৮)

হাদীস নং-২

عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا، فأحسنه وأجمله، إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به، ويعجبون له، ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبيين.

(অর্থ:) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার এবং পূর্ববর্তী নবীদের উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মতো যে একটি বাড়ী বানালো এবং এক কোণের একটি ইঁটের জায়গা ব্যতীত পুরা বাড়িটা চাকচিক্য ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করল। অতঃপর লোকেরা তা প্রদক্ষিণ করতে লাগলো। বাড়িটা তাদের খুবই পছন্দ হলো এবং বলতে লাগলো হায়! যদি এই ইঁটটাও লাগানো হতো! আর আমিই হলাম সেই অপূর্ণ ইঁট, আর আমিই খাতামুন্নাবিয়্যীন।[৬] (সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৫৩৫ সহীহ মুসলিম; হা.নং ২২৮৬)

হাদীস নং-৩

عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء: وأنا العاقب

অর্থ: হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম রাযি. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবীজী আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, আমার পাঁচটি বিশেষ গুণবাচক নাম আছে; ...তার মধ্যে একটি হলো **'আকিব'**। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৫৩২)

মা'মার ইবনে রাশেদ রহ. (মৃ. ১৫৩ হি.) স্বীয় কিতাবে উল্লিখিত হাদীস উল্লেখ করে **'আকিব' শব্দের** নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা করেছেন–

عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء أنا أحمد، وأنا محمد، وأنا الماحي: الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر: الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب قال معمر: قلت للزهري: وما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبي،

অর্থাৎ ... মা'মার রহ. বলেন, আমি ইমাম যুহরী রহ. থেকে এই হাদীসটি শোনার পর তাকে জিজ্ঞেস করলাম 'আকিব' কী? উত্তরে তিনি বললেন, 'আকিব' মানে যার পরে কোনো নবী নেই। (জামে' মা'মার বিন রাশেদ; হা.নং ১৯৬৫৭)

হাদীস নং-৪

عن سعيد بن المسيب: أن أبا هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة

(অর্থ:) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, আমি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, (আমার আগমনের পরে) নবুওয়্যাতের কোনো অংশ বাকী নেই **'মুবাশ্শিরাত'** ব্যতীত। সাহাবীগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! **'মুবাশ্শিরাত'** কী জিনিস? জবাবে নবীজী আলাইহিস সালাম বললেন, 'মুবাশ্শিরাত হলো ভালো স্বপ্ন। (যা কোনো মুসলমান নিজে দেখে বা অন্য কেউ তার জন্য দেখে।) (সহীহ বুখারী; হা.নং ৯৯০, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২৪৯৭৭)

হাদীস নং-৫

عن سعد بن أبي وقاص، قال: خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك فقال: يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي

(অর্থ:) হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি. বলেন, তাবুক যুদ্ধে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাযি.-কে খলীফা নিযুক্ত করলেন। তখন আলী রাযি. আরয করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে নারী ও শিশুদের মাঝে ছেড়ে যাচ্ছেন? উত্তরে নবীজী বললেন, তুমি কি এতে খুশী নও যে, হযরত হারূন আলাইহিস সালাম হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে যেমন ছিলেন তুমিও আমার সঙ্গে তেমন হয়ে যাও? তবে (হযরত হারূন নবী ছিলেন আর) আমার পরে কোনো নবী নেই। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৪০৪)

এই হাদীসে নবীজী আলাইহিস সালাম হযরত আলী রাযি.-কে নবী ভাবার সুযোগটুকু পর্যন্ত বাকী রাখেননি। সেখানে কেউ নতুন করে কিভাবে নবী হতে পারে।

হাদীস নং-৬

عن فرات القزاز، قال: سمعت أبا حازم، قال: قاعدت أبا هريرة خمس سنين، فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم

(অর্থ:) আবূ হাযিম রহ. বলেন, আমি আবূ হুরাইরা রাযি.-এর সান্নিধ্যে পাঁচ বছর ছিলাম। আমি তাকে নবীজী আলাইহিস সালামের ইরশাদ বয়ান করতে শুনেছি যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বনী ইসরাঈলদের রাষ্ট্র পরিচালনার কাজ তাদের নবীরাই আঞ্জাম দিতেন। কোনো নবীর ইন্তেকাল হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলা অন্য কোনো নবীকে তার খলীফা বানিয়ে পাঠাতেন। তবে আমার পরে কোনো নবী নেই, অবশ্য অনেক খলীফা হবে। এ কথা শুনে সাহাবীগণ (রাযি.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ঐ সকল খলীফার ব্যাপারে আমাদের জন্য আপনার নির্দেশনা কী? জবাবে নবীজী আলাইহিস সালাম বললেন, একের পর এক সকল খলীফার হাতে বাই'আত হবে এবং পরিপূর্ণভাবে তাদের

৬. 'খাতামুন্নাবিয়্যীন'-এর ব্যাখ্যা পূর্বে ২০ নং পৃষ্ঠায় আতিবাহিত হয়েছে।

অনুসরণ করবে। কেননা তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৪৫৫)

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী রহ. (মৃ. ৮৫২হি.) লিখেছেন–

قوله تسوسهم الأنبياء أي أنهم كانوا إذا ظهر فيهم فساد بعث الله لهم نبيا يقيم لهم أمرهم ويزيل ما غيروا من أحكام التوراة

অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের মধ্যে যখন ফাসাদ সৃষ্টি হতো তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য কোনো নবীকে প্রেরণ করতেন যিনি তাদের উদ্ভূত সমস্যা সমাধান করতেন এবং তারা তাওরাতের মধ্যে যে বিকৃতি ঘটিয়েছে তা ঠিক করে দিতেন। (ফাতহুল বারী ৬/৪৯৭)

এর দ্বারা বুঝা যায়, বনী ইসরাঈলের মধ্যে আগত নবী নতুন শরীয়ত নিয়ে আসতেন না; বরং হযরত মূসা আলাইহিস সালামের শরীয়তেরই অনুসরণ করতেন। আর এটাকেই মির্যা কাদিয়ানী 'শরীয়তবিহীন' নবী বলে আখ্যায়িত করেছে এবং নিজেকে এই পর্যায়ের নবী বলে দাবী করেছে। অথচ উক্ত হাদীসে নবীজী আলাইহিস সালাম সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, আমার শরীয়তে এই ধরনের নবুওয়্যাতেরও কোনো সুযোগ নেই।

'আকীদায়ে খতমে নবুওয়্যাত'-এর উপর উম্মতের ইজমা তথা ঐকমত্য

উম্মতে মুহাম্মাদীর একটি অনন্য ও অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, এই উম্মতের উলামায়ে কেরামকে কুরআনে হাকীমে এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যবান মুবারকে বিশেষ মূল্যায়ন দেয়া হয়েছে এবং ইসলামী শরীয়তে তাদের ইজমা তথা ঐকমত্যের উপর আমল করা কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট বিধি-বিধানের উপর আমল করার মতই ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تجتمع أمتي على الضلالة أبدا، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة

(অর্থ:) হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার উম্মত কখনোই ভ্রষ্টতার উপর একমত হবে না। সুতরাং তোমাদরে জন্য জরুরী হলো, তোমরা উম্মতের অধিকাংশের গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর আমল করবে। কেননা জামা'আতের (অধিকাংশের) সাথে আল্লাহর সাহায্য রয়েছে। (আল মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানী; হা.নং ১৩৬২৩)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (মৃ. ৭২৮হি.) বলেন–

وإجماعهم حجة قاطعة يجب اتباعها بل هي أوكد الحجج وهي مقدمة على غيرها، وليس هذا موضع تقرير ذلك، فإن هذا الأصل مقرر في موضعه، وليس فيه بين الفقهاء بل ولا بين سائر المؤمنين الذين هم المؤمنون خلاف،

অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের ঐকমত্য শরীয়তের এমন অকাট্য প্রমাণ, যার উপর আমল করা ওয়াজিব; বরং তা শরীয়তের অন্যান্য প্রমাণাদির চেয়েও বেশী গুরুত্ববহ এবং অগ্রগণ্য। ... এবং এ ব্যাপারে সকল ফকীহ (ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ) এমনকি সকল মুসলমানের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই। (ফাতাওয়ায়ে কুবরা ৬/১৬২)

সুতরাং যে ব্যাপারে এই উম্মতের উলামায়ে কেরামের ইজমা তথা ঐকমত্য সংঘটিত হবে তা মানা ওয়াজিব এবং কেউ তার বিরুদ্ধাচারণ করলে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে। আর 'আকীদায়ে খতমে নবুওয়্যাত'-এর উপর এই উম্মতের ইজমা সংঘটিত হয়ে গেছে।

বিখ্যাত মুফাসসির আল্লামা আলূসী বাগদাদী রহ. (মৃ. ১২৭০হি.) বলেন–

وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين مما نطق به الكتاب وصدعت به السنة وأجمعت عليه الأمة فيكفر مدعي خلافه ويقتل إن أصر.

অর্থাৎ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাতামুন্নাবিয়্যীন হওয়া ঐ সকল আকীদার অন্তর্ভুক্ত যে সকল আকীদার কথা খোদ কুরআন বলেছে, সুন্নাহ যে ব্যাপারে সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছে এবং সকল উম্মত যার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছে। সুতরাং কেউ আকীদায়ে খতমে নবুওয়্যাতের বিপরীত কিছু দাবী করলে সে কাফের বিবেচিত হবে এবং তাওবা না করে নিজ ভ্রান্ত আকীদায় অটল থাকলে তাকে হত্যা করা হবে। (রূহুল মা'আনী ১১/২১৯)

সুতরাং কুরআন সুন্নাহ এবং ইজমায়ে উম্মতের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হলো যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী তার পরে নতুন করে যিল্লী, বুরূজী, বা শরীয়তবিহীন কোনো প্রকারের নবী জন্ম নেবে না। এটাকে 'আকীদায়ে খতমে নবুওয়্যাত' বলা হয়, যার অস্বীকারকারী শরীয়তের অকাট্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা কাফের সাব্যস্ত হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর :

কাদিয়ানী ও ইসলাম ধর্মের মধ্যকার পার্থক্যটা কোন শাখাগত বিষয়ে নয়, বরং এমন সব মৌলিক আকীদাগত বিষয়ে, যে আকীদা উভয়ের মাঝে ইসলাম ও কুফ্‌রের ব্যবধান তৈরি করে দেয়। তন্মধ্যে কাদিয়ানীদের একটি মারাত্মক ভ্রান্ত আকীদা হলো– আখেরী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী বলে স্বীকার না করা এবং মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীকে নবী মনে করা (নাউযুবিল্লাহ)। কাদিয়ানীরা ইসলাম ধর্মের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গিয়ে এক নতুন ধর্ম আবিষ্কার করেছে, যা বাহ্যত ইসলাম-সদৃশ হলেও তাদের আকীদা-বিশ্বাস কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী। কাদিয়ানী এবং অন্যান্য কুফুরী ধর্মের মধ্যে রিসালাত (তথা নবীজীর রাসূল হওয়া)-এর আকীদার ক্ষেত্রে পার্থক্য এতটুকু যে, কাফের-মুশরিকরা নবীজীর রিসালাতকে অস্বীকার করে, আর কাদিয়ানীরা নবীজীর রিসালাতকে স্বীকার করলেও তার 'খাতামুন্নাবিয়্যীন' হওয়াকে অস্বীকার করে। নবীজীকে রাসূল বলে স্বীকার করা এবং শেষ নবী বলে স্বীকার করা এই উভয়টি ইসলামের এমন শাশ্বত আকীদা যে, এর কোন একটি অস্বীকার করার কারণে অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফের হয়ে যায়। এ সম্পর্কে দলীলভিত্তিক আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

একনজরে ইসলাম ও কুরআন-হাদীস বিরোধী কাদিয়ানী ধর্মের কিছু আকীদা

এক.

ইসলাম: মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাতামুন্নাবী। (সূরা আহযাব-৪০)

কাদিয়ানী: গোলাম আহমদ কাদিয়ানী খাতামুন্নাবী। (কাদিয়ানীদের পত্রিকা; আলে ফজল ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯১৫)

দুই.

ইসলাম: মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামত পর্যন্ত আসন্ন সকলের নবী। (সূরা নিসা-৭৯)

কাদিয়ানী: ঈসায়ী ১৪ শতাব্দী থেকে কাদিয়ানী সকলের রাসূল। (কাদিয়ানী-দের কিতাব; 'তাযকিরা'; পৃষ্ঠা ৮৩)

তিন.

ইসলাম: মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই রাহমাতুল্লিল আলামীন। (সূরা আম্বিয়া-১০৭)

কাদিয়ানী: গোলাম আহমদ কাদিয়ানী রাহমাতুল্লিল আলামীন। (কাদিয়ানীদের কিতাব; 'তাযকিরা'; পৃষ্ঠা ৮৩)

(১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মানবসভ্যতা এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মুসলিমদের অবদান

মাওলানা মাহমূদুল হাসান ফরিদপুরী

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর সর্বপ্রথম ওহী হিসেবে কুরআনে কারীমের সূরা আলাকের প্রথম যে পাঁচটি আয়াত অবতীর্ণ হয়, তার বিষয়বস্তু ছিলো 'ইলম' বা 'জ্ঞান'। ইরশাদ হচ্ছে–

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

(অর্থ:) পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত হতে। পড়ো এবং তোমার প্রতিপালক সর্বাপেক্ষা বেশি মহানুভব। যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। (সূরা আলাক-১-৫)

সর্বপ্রথম নাযিলকৃত এ আসমানী প্রত্যাদেশে ইসলামের প্রথম যে তত্ত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, তা এই যে, দীন-ইসলাম এমন একটি জীবনব্যবস্থা, যা ভ্রষ্টতা ও অবাস্তব কল্পনার বিপরীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত।

কুরআনে কারীম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বযুগকে জাহেলী যুগ (অজ্ঞতার যুগ) বলা হতো। অর্থাৎ জাহেলী অবস্থা ইসলামপূর্ব যুগে ছিল। ইসলাম এসে জাহালাত ও অজ্ঞতার সেই নিকষ অন্ধকার দূরীভূত করে জ্ঞানের মশাল প্রজ্জ্বলিত করেছে; যেন আল্লাহর হিদায়াতের আলোয় পৃথিবী উদ্ভাসিত হয়ে যায়!

ইতিহাস এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, ষষ্ঠ শতকে ইসলামের আগমনের পূর্বে মানবতা ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে পৃথিবী কতোটা অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। গ্রিক, পারসিক, হিন্দু ও রোমক সভ্যতাসমূহ যদিও মানবজাতির পার্থিব উন্নয়নকল্পে অবদান রেখেছে, তথাপি অনৈতিকতা, অন্যায়-অনাচার ও মানবতাহীন সমাজব্যবস্থাই ছিলো সে যুগের অন্ধকার চিত্র। গ্রিক সভ্যতায় শাসক ও শোষিত শ্রেণির সামাজিক শ্রেণীভেদ, হিন্দু সভ্যতায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের অনতিক্রম্য বৈষম্য, মূর্তিপূজার প্রতি তাদের অদ্ভুত সম্মোহন এবং স্বামীর মৃত্যুর পর মৃত স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সহমরণ (সতীদাহ প্রথা) কিংবা পার্থিব লাঞ্ছনা ও দুর্ভাগ্য থেকে বাঁচতে জ্বলন্ত আগুনে আত্মহনন, পারসিক সভ্যতায় কন্যা ও বোনকে বিবাহের অবাধ নীতি, সম্পদ ও নারীর যৌথ মালিকানা এবং সম্রাট ও রাষ্ট্রপ্রধানগণ খোদার আসনে সমাসীন মর্মে ধারণা, রোমক সভ্যতায় চার্চের জুলুম-নির্যাতন, ছেলে ও মেয়ে শিশুর উপর যৌন নিপীড়ন এবং দাসশ্রেণীর প্রতি অন্যায় আচরণ, আরব্য জাহেলী সমাজের অজ্ঞতা, বর্বরতা, অনৈতিকতা, মূর্তিপূজার অবাধচর্চা, জুয়া খেলায় স্ত্রীকে বাজি ধরা কিংবা সুদর্শন পুরুষের কাছে বর্গা দেওয়ার ঘৃণ্য মানসিকতা আর কন্যা সন্তানকে জীবন্ত দাফন করার মর্মান্তিক প্রথা– এ সব-ই ছিল ইসলামপূর্ব অন্ধকার যুগের সামগ্রিক অবস্থা।

পৃথিবীকে এ ঘোর অমানিশা থেকে চিরমুক্তিদানের জন্য আগমন ঘটেছিল ইসলামের। পূর্বাপর মানব সভ্যতার তুলনায় ইসলামী সভ্যতার বৈশিষ্ট্যাবলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, যা তাকে অন্যান্য সকল সভ্যতা থেকে সুষমামণ্ডিত করেছে। আর তা এ জন্য যে, ইসলামী সভ্যতা খোদায়ী নির্দেশনা তথা দীন-ইসলামের ভিত্তিমূলের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে নির্দেশনায় রয়েছে মানবতা ও সার্বজনীনতা এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একেশ্বরবাদিতা। ইসলামী সভ্যতা মূলত 'মানবতা'র প্রতিচ্ছবি, যার প্রভাব সার্বজনীন এবং বিশ্ববিস্তৃত। নির্দিষ্ট কোনো ভৌগলিক গণ্ডির সাথে তা সীমাবদ্ধ নয়; বরং সকল যুগ ও জাতির জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য এবং তার প্রভাব সকল ভূখণ্ড ও অঞ্চলের জন্য সাযুজ্যপূর্ণ। ইসলামী সভ্যতা এমন এক সভ্যতা, যার ছায়ায় আশ্রয় নিতে পারে সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ এবং তার দানে উষ্ণতা লাভ করে শিহরিত হতে পারে সামজের প্রতিটি সদস্য!

এ সকল কারণে ইসলামের আগমনে মানবতা তার মুমূর্ষু দেহে পেয়েছিল প্রাণের ছোঁয়া। শত-সহস্র বছরের অন্যায়-অনাচারের ছাই-ভস্ম থেকে পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল মৃতপ্রায় সভ্যতা। মূর্তিপূজা ও সম্রাটপূজা বাতিল করে একত্ববাদ প্রতিষ্ঠাকরণ, মানবীয় সাম্য, অধিকার ও দায়িত্বের সমন্বয় সাধন, নারী, অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম, মিসকীন, বিধবা, সংখ্যালঘু, প্রাণীজগত ও পরিবেশের অধিকার বাস্তবায়ন, মানবাধিকার, ন্যায়পরায়ণতা ও অধিকার সচেতনতার গুণে মানবসমাজের পরিশীলন, দাসশ্রেণীর সামাজিক সম্মান ও মর্যাদা নিশ্চিতকরণ এবং ক্রমান্বয়ে দাসপ্রথা বিলুপ্তিকরণ, মানবসম্প্রদায়ের সুসংরক্ষণ ও নৈতিক অধঃপতন রোধে সুদৃঢ় পরিবারনীতির সফল চিত্রায়ন, পিতা-মাতা, সন্তান ও সমাজের সকল সদস্যের অধিকার ও দায়িত্বের গণ্ডি নির্ধারণ, সামাজিক ক্ষেত্রের পাশাপাশি যুদ্ধক্ষেত্রেও মানবতা ও নৈতিকতার প্রদর্শনসহ প্রভূত গুণাবলীর মাধ্যমে ইসলাম মানবতার মুমূর্ষু দেহে সঞ্চার করেছিল নতুন প্রাণ! ফলশ্রুতিতে পচনধরা মানবাত্মা পেয়েছিল জেগে উঠার নতুন প্রেরণা! সমাজ নামক দেহের প্রতিটি অঙ্গে অশ্লীলতা ও পাপাচারের যে ক্ষত ছড়িয়ে পড়েছিল, ইসলামী সভ্যতা পরম যত্নে সে ক্ষত সারিয়ে তুলেছিল।

পারস্পারিক ভালোবাসা, আন্তরিকতা, অপরের হিতকামনা, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং স্রষ্টার সম্মুখেই কেবল মস্তক অবনত করা ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ত্রুটিমুক্ত প্রায়োগিক আদর্শে জীবন গঠনের মানসিকতা মুসলিমজাতিকে সাহসী, সত্যাশ্রয়ী ও সৃজনশীল হতে এবং মানবসভ্যতার গঠনে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। যার ফলে ইসলামের সযত্নে ছোঁয়ায় ঘুনেধরা সমাজ যখন প্রাণ ফিরে পেলো, তখন তার জাগরণ এতটা তীব্র ও বিস্ময়কর হল যে, মানবসম্প্রদায় নিমিষেই অসভ্যতার সর্বনিম্ন স্তর থেকে সভ্যতার সর্বোচ্চ স্তরে সমাসীন হয়ে গেলো! Gustave Le Bon-এর বক্তব্যে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন, 'নিশ্চয় আরব মুসলমানদের সভ্যতা ইউরোপের জংলী জাতিগুলোকে মনুষ্যসমাজে প্রবেশ করিয়েছে! পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আরবদের রচনাবলী ছাড়া আর কোনো শিক্ষার উৎস ছিল না। আরবরাই ইউরোপবাসীকে পার্থিব উপকরণ, চিন্তা ও গবেষণা এবং নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে সভ্যতা প্রদান করেছে। (সভ্যতার ক্ষেত্রে) আরবরা যতোটুকু অবদান রেখেছে, আর কোনো জাতি তা রাখতে সক্ষম হয়নি।' (গুস্তাভলি ভন, হাযারাতুল আরব; পৃষ্ঠা ২৭৬)

উল্লিখিত আলোচনায় এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সর্বপ্রথম নাযিলকৃত আসমানী ওহী'র নির্দেশনা মোতাবেক

ইসলাম সর্বপ্রথম মানবজাতিকে ‘অসভ্যতা, অন্যায়-অনাচার ও লাঞ্ছনার অন্ধকার থেকে মুক্ত করেছে। মানবীয় সম্মান ও অধিকার নিশ্চিত করে সমাজের অনৈতিকতার মূলোৎপাটন করেছে। এরপর, ইসলামের অবদান কেবল এ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাশাপাশি জাগতিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমেও মানবসেবায় ব্রতী হতে সে প্রতিটি মুসলিমকে উৎসাহিত করেছে। কেননা, প্রথম আসমানী ওহী ‘পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন’-এর আদেশ পালনার্থে যদিও কেবল ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয তথা অত্যাবশ্যকীয় প্রমাণিত হয় এবং কুরআন ও হাদীসে ‘ইলম’ বা জ্ঞানার্জনের ফযীলত ও উপকারিতাগুলো কেবল দীনী ইলমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আর এই দীনী ইলমই কেবল আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের মীরাছ বা উত্তরাধিকার সম্পত্তি, তথাপি কুরআন ও হাদীসের সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দুনিয়া যেহেতু দারুল আসবাব অর্থাৎ এখানে সবকিছু বাহ্যিকভাবে উপায়-উপকরণের উপর নির্ভরশীল এবং দুনিয়ার সবকিছু আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন, কাজেই মানবজাতির ইহজাগতিক কল্যাণকর প্রমাণিত হয়–এমন জাগতিক শিক্ষাও শরীয়তমতে বৈধ। এমনকি দীনের সহযোগী হিসেবে এবং কুফর ও বাতিলের বিরুদ্ধে ইসলাম ও মুসলমানদের স্বকীয়তা ও শ্রেষ্ঠত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে প্রয়োজনীয় জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা ক্ষেত্রবিশেষে একটি প্রশংসনীয় বিষয়। (রদ্দুল মুহতার ১/৪২, ইমদাদুল আহকাম ১/২২৩, আহসানুল ফাতাওয়া ১/৪৫৩-৪৫৪)

বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ ইবনে আমীর হাজ রহ. (৮৭৯ হি.) দীনের জন্য প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষাকে ‘ফরযে কিফায়া’ তথা (প্রত্যেক ব্যক্তির উপর নয়; বরং) সামগ্রিকভাবে মুসলিমজাতির উপর অর্জন করা আবশ্যক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ মর্মে তিনি তার ‘আত্ তাকরীর ওয়াত্ তাহবীর’ গ্রন্থে (২/১৩৫, মাকতাবায়ে শামেলা) ‘ফরযে কিফায়া’র সংজ্ঞা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

وَهُوَ مُهِمٌّ مُتَحَتِّمٌ مَقْصُودٌ حُصُولُهُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ بِالذَّاتِ إِلَى فَاعِلِهِ فَتَنَاوَلَ مَا هُوَ دِينِيٌّ كَصَلَاةِ الْجَنَازَةِ وَدُنْيَوِيٌّ كَالصَّنَائِعِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهَا

(অর্থ:) ‘ফরযে কিফায়া’ হলো, এমন আবশ্যকীয় বিষয়, যা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর স্বতন্ত্রভাবে অর্জন করা আবশ্যক নয় (বরং সামগ্রিকভাবে মুসলিম জাতির উপর অর্জন করা আবশ্যক)। ফরযে কিফায়া’র মধ্যে দীনী বিষয় উদাহরণস্বরূপ জানাযার নামায ইত্যাদি যেমন রয়েছে, তেমনি দুনিয়াবী বিষয় যেমন পার্থিব জীবনের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম ইত্যাদিও রয়েছে।’

পার্থিব প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জনের বৈধতার বিষয়টি কুরআনে কারীমের নিম্নলিখিত আয়াত দ্বারাও বোঝা যায়। ইরশাদ হচ্ছে–

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ

(অর্থ:) ‘তোমরা তাদের (কাফেরদের) বিরুদ্ধে তোমাদের সাধ্যমতো শক্তি ও অশ্ব-ছাউনি প্রস্তুত কর! যা দ্বারা তোমরা আল্লাহর শত্রু এবং নিজেদের (বর্তমান) শত্রুদেরকে সন্ত্রস্ত করে রাখবে...।’ (সূরা আনফাল-৬০)

মুফাস্সিরদের বর্ণনামতে, উল্লিখিত আয়াতে সমগ্র মুসলিম জাতিকে ইসলাম ও মুসলিমদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত রাখার উদ্দেশ্যে যুগচাহিদা অনুপাতে সব রকম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশনা বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম গাজালী রহ. তার ‘ইয়াহইয়াউ উলূমিদ্ দীন’ গ্রন্থে ইলম অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে, ‘জাগতিক জ্ঞান তথা যে বিদ্যা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম থেকে অর্জিত হয়নি, তা মূলত তিন প্রকার–

এক. যা শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রশংসনীয় ও আবশ্যকীয়।

দুই. যা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ।

তিন. যা শরীয়তের দৃষ্টিতে আবশ্যকীয়ও নয়, আবার নিষিদ্ধও নয়।

প্রশংসনীয় ও আবশ্যকীয় জাগতিক জ্ঞান হলো এমন বিদ্যা, দুনিয়ার বসবাসের ক্ষেত্রে কল্যাণ ও উপকারিতার বিষয়াবলী যার সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেমন চিকিৎসা-বিজ্ঞান, কেননা মানবদেহ সংরক্ষণের জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞান আবশ্যক। তেমনি গণিতশাস্ত্র, কেননা লেনদেন, মীরাছ ও ওসিয়্যত বণ্টন ইত্যাদির ক্ষেত্রে গণিতের আবশ্যকতা রয়েছে। আর শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ জ্ঞান যেমন যাদুটোনা, ভেলকিবাজি ইত্যাদি। তৃতীয়ত, শরীয়তের দৃষ্টিতে কেবল বৈধ জ্ঞান যেমন (উদাহরণস্বরূপ) এমন কাব্য ও রচনাবলী যাতে উপদেশমূলক বক্তব্য থাকে, কারো প্রতি তাচ্ছিল্য কিংবা পরনিন্দা বা এ জাতীয় অবৈধ কিছু থাকে না।’

প্রশংসনীয় ও প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার ব্যাপারে ইসলামের এ উদার দৃষ্টিভঙ্গির দরুন যুগে যুগে মুসলিমগণ ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি জাগতিক প্রয়োজনীয় ও উপকারী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অসামান্য অবদান রেখেছেন। মুসলিমদের মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোতে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি জাগতিক প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীও পাঠ্যসিলেবাসের আওতাভুক্ত ছিল। যার ফলে মুসলিমবিজ্ঞানী, দার্শনিক, ভূ-তত্ত্ববিদ, ফার্মাসিস্ট, চিকিৎসাবিদ, গণিতবিদ, প্রকৌশলবিদ, পদার্থবিদ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, সমাজ-বিজ্ঞানী, কবি-সাহিত্যিক, বণিক, পর্যটক প্রমুখ বিদ্বানশ্রেণীর অবদানে মানবসভ্যতা পৌঁছে গিয়েছিল অনন্য উচ্চতায়! ফলে শ্রেষ্ঠত্ব, ক্ষমতা এবং বিশ্বময় বুদ্ধিবৃত্তিক, সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে মুসলিমরা ছিল অতুলনীয়!

মানবসভ্যতার গঠনে মুসলিম মনীষীদের এ অসামান্য অবদানের সূচনা হয় খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের মাঝামাঝি থেকে। এরপরের দীর্ঘ প্রায় সাতশত বছর ছিলো মুসলিম সভ্যতার ক্রমোন্নতির যুগ। এগারো শতকে শুরু হওয়া ক্রুসেড যুদ্ধ এবং ১২৫৮ সালের ২৯ জানুয়ারী হালাকুখানের নেতৃত্বে আক্রমণকারী মঙ্গোল বাহিনী ও তার মিত্র শক্তিদের হাতে পতন ঘটে মুসলিম সভ্যতার, অস্তমিত হয় সভ্যতা, মানবতা ও ন্যায়পরায়ণতার তেজোদ্দীপ্ত সূর্যের...! মঙ্গোল বাহিনীর হাতে পতনের পূর্ব পর্যন্ত সময়টিকে ইতিহাসে ‘ইসলামের স্বর্ণযুগ’ নামে নামকরণ করা হয়। এই স্বর্ণযুগে প্রথম পর্যায়ে প্রভাতী মকতবে শিশুদের পাঠদান দিয়ে শুরু হলেও মুসলিমদের জ্ঞানসাধনা সেখানেই থেমে থাকেনি; বরং ‘উমাইয়া জামে মসজিদ (দামেস্কে)’, ‘আমর ইবনে আস রাযি. জামে মসজিদ (‘ফুসতাত’), ‘আল-আযহার জামে মসজিদ’ (মিসর), ‘যায়তুনাহ জামে মসজিদ’ (তিউনিসিয়া), ‘করওয়িয়িন জামে মসজিদ’(মরক্কোর ‘ফেয’ নগরী)-সহ ইসলামী বিশ্বের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে গড়ে উঠেছিলো মসজিদ-ভিত্তিক মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থা। কেবল ধর্মীয় বিষয়ই নয়; বরং পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়েও এ সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেয়া হতো। গগনচুম্বী সুনাম-সুখ্যাতির দরুন শিক্ষার্থীরা অন্যান্য দেশ থেকেও এ সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগ্রহণ করতে ছুটে আসত। এমনকি এ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইউরোপীয়ানদের মুক্ত ক্যাম্পাসে পরিণত হয়েছিলো। যদ্দরুন, খ্রিস্টান ধর্মযাজক Gerbert of Aurillac–যিনি পরবর্তীতে Pope Sylvester II (৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ-

১০০৩ খ্রিস্টাব্দ) নামে রোমের ভ্যাটিকান সিটির বিশপ হয়েছিলেন– তিনি করওয়িয়েন জামে মসজিদে পড়াশোনা করে জাগতিক বিভিন্ন বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন! (আব্দুল্লাহ মাশুখী, মাওকিফুল ইসলাম ওয়াল কানিসা মিনাল ইলম; পৃষ্ঠা ৫৬)

তৃতীয় পর্যায়ে মুসলিমগণ স্বতন্ত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধারার সূচনা করেন। এমনকি 'ইউরোপ যখন গির্জা ও মঠ ব্যতীত অন্য কোনো শিক্ষালয়ের কথা কল্পনাও করেনি, তার শত শত বছর আগে মুসলমানরা স্বতন্ত্র শিক্ষাব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে বড়বড় মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছিল। এ সকল প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়েছিল ৩৮৩ হিজরী সনে 'মন্ত্রী আবূ নসর সাবূর ইবনে আরদাশীর কর্তৃক 'কারখ' শহরে প্রতিষ্ঠিত 'দারুল ইলম' (জ্ঞানের ঘর)-এর মাধ্যমে।' (ইবনে কাসীর, আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১১/৩১২)

ইসলামীবিশ্বের তৎকালীন মাদরাসার অবস্থা সম্পর্কে বুত্রুস আলবুস্তানী Butrus al-Bustani (জন্ম : ১৮১৯ মৃত্যু : ১৮৮৩)-এর সূত্রে ঐতিহাসিক হেলাম বর্ণনা করেন– 'জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণাকেন্দ্র আরবদের মাদরাসাগুলো ছিলো উজ্জ্বল ও আলোকময়! বাগদাদ থেকে নিয়ে কর্ডোভা পর্যন্ত তা বিস্তৃত ছিলো। (তৎকালীন) মুসলমানদের সতেরোটি কলেজ মাদরাসা ছিলো। এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিলো কর্ডোভার মাদরাসা। বলা হয়ে থাকে যে, এ মহাবিদ্যালয়ে এমন একট সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার রয়েছে, যাতে ৬০০ জন যুগসংস্কারক মনীষীর গ্রন্থাবলী স্থান লাভ করেছে! এ বিদ্যালয়ে ছরফ-নাহব (আরবী ব্যাকরণশাস্ত্র), কাব্য, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন, গণিতশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয় পড়ানো হতো। প্রতিটি মসজিদের সন্নিকটে মুসলিমদের একটি প্রাথমিক মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত ছিলো, যেখানে শিক্ষার্থীদেরকে পড়া এবং লেখা শেখানো হতো।'[৭]

মুসলিম সভ্যতায় জ্ঞানচর্চার অংশ হিসেবে গড়ে উঠেছিলো একাডেমিক গ্রন্থাগার, ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার, গণগ্রন্থগার, মাদরাসা-কেন্দ্রিক গ্রন্থাগার, মসজিদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক গ্রন্থাগারসহ বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারব্যবস্থাপনা। এ সকল গ্রন্থাগারে এত অধিক পরিমাণে মৌলিক ও অনুবাদকৃত গ্রন্থ সংগৃহীত হয়েছিল যে, উমাইয়া খলীফা আল-হাকাম মুসতানসির (৩৫০ হিজরী মোতাবেক ৯৬১ খ্রিস্টাব্দ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কর্ডোভার গণগ্রন্থাগারে কিতাবের তালিকা সংবলিত সূচিপত্রের সংখ্যাই ছিল ৪৪ খণ্ড! প্রতিটি সূচিপত্রে ২০টি পৃষ্ঠা ছিল, যেগুলোতে কেবল গ্রন্থাগারের কিতাবের নাম লিপিবদ্ধ ছিল!![৮]

মুসলিম সভ্যতায় বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলো 'বাইতুল হিকমাহ' (House of Wisdom বা 'বিজ্ঞানভবন')। গ্রন্থাগার বিভাগ, অনুবাদ বিভাগ, গবেষণা ও সংকলন বিভাগ, জ্যোতির্বিজ্ঞানের মানমন্দির ও মাদরাসা নিয়ে গঠিত হয়েছিল 'বাইতুল হিকমাহ'র সুবিশাল ক্যাম্পাস। বাইতুল হিকমাহ'র গ্রন্থাগার ইমাম খুওয়ারিযমী রহ., ইমাম রাযি, ইবনে সিনা, আল বেরুনী, বাত্তানী, ইবনে নাফিস, ইদ্রীসী প্রমুখের মতো শত-সহস্র প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদের ব্যক্তিসত্তার স্তম্ভকে সুদৃঢ় করেছে।

শিক্ষাব্যবস্থায় এই উৎকর্ষের দরুন মুসলিমদের তত্ত্বাবধানে পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এমনকি মুসলমানগণ পৃথিবীর অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোর মতো এক্ষেত্রেও নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে আবূ বকর রাযি, ইবনে ঈসা কাহ্হাল, আবুল কাসেম যাহরাবী, ইবনে সিনা প্রমুখ মনীষী ব্যাপক অবদান রাখেন। এ সকল মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী সার্জারির বিভিন্ন অস্ত্র যেমন, শল্যছুরিকা, শল্যকাঁচি, সার্জারিসুতা, রক্তক্ষরণ বন্ধে রক্তনালী বাঁধা ও জমাট বাঁধানোর ফর্মুলা, যোনিসংক্রান্ত রোগনির্ণয়ের সার্জিক্যাল ক্যামেরা (Colposcope)-উদ্ভাবন, টনসিল (tonsils) নির্মূলের পদ্ধতি, লিভার ক্যান্সার, ব্রেস্ট ক্যান্সার সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা,[৯] ক্যান্সারের টিউমার অপারেশন,[১০] কণ্ঠাস্থি ও শ্বাসনালী অপারেশন, ফুসফুসের স্ফটিক ঝিল্লির ফোঁড়া অপারেশন এবং বন্ধন প্রক্রিয়ায় অর্শ্বরোগের চিকিৎসা, ক্যাথেটার (catheter-মূত্রনিষ্কাশনের নলবিশেষ) ব্যবহারের পদ্ধতি, করণীয় ও বর্জনীয় দিক সম্পর্কে আলোচনাসহ চিকিৎসা শাস্ত্রের মৌলিক বিভিন্ন বিষয়ে অবদান রাখেন।[১১] যাহরাবী'র লিখিত চিকিৎসা বিষয়ক 'আততাসরীফ' (Al-Tasrif) গ্রন্থটির সার্জারি অধ্যায় সম্পর্কে Physiology (দেহতত্ত্ব)-এর বড় গবেষক ড. হালর বলেন– 'চৌদ্দ শতকের পর আগত সকল ইউরোপীয় সার্জন এ অধ্যায় থেকে সীমাহীন উপকৃত হয়েছেন।'[১২]

পদার্থবিজ্ঞানে অবদান রাখেন আল-খাযিনী, ইবনে সিনা, হিবাতুল্লাহ ইবনে মালকা আল-বাগদাদী, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রহ., ইবনে হাইসাম, আবূ মুহাম্মদ হাসান বিন আহমদ বিন ইয়াকুব আল-হামদানি প্রমুখ মুসলিম মনীষী। এ সকল মনীষী স্যার আইজ্যাক নিউটনের অনেক আগেই গতির সূত্র এবং মাধ্যাকর্ষণসূত্র আবিষ্কার করেছিলেন।

জ্যামিতি ও গণিতশাস্ত্রে অসামান্য অবদান রাখেন আল-বিরুনী, নাসীরুদ্দীন তুসী, আল-কুনজী, আল্লামা ফারগানী, সাবেত ইবনে কুররা, খুওয়ারিজমী, মুসা ইবনে শাকেরের সন্তানত্রয়, বাহাউদ্দীন আল-আমেলী প্রমুখ মনীষী। ফরাসী প্রাচ্যবিদ ব্যারনডি ভক্স Baron Carra De Vaux (জন্ম: ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ, মৃত্যু: ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ) বলেন, 'আরবরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বড় বড় আবিষ্কারগুলো করেছেন। তাঁরা আমাদেরকে শূন্যের ব্যবহার শিক্ষা দিয়েছেন। দৈনন্দিন জীবনে হিসাবের ব্যবহার শিখিয়েছেন। বীজগণিতকে সুসংহত ও উন্নত করেছেন। স্থানাঙ্ক জ্যামিতির[১৩] ভিত্তি স্থাপন করেছেন। যদি আমরা সূক্ষ্মভাবে ও ইনসাফের দৃষ্টিতে লক্ষ করি, তাহলে স্বীকার করতে বাধ্য হব যে, সমতল ও গোলাকার ত্রিভুজ আবিষ্কারের কৃতিত্ব গ্রিকদের নয় বরং নিরঙ্কুশভাবে মুসলমানদের।'[১৪]

ভূগোলশাস্ত্রে অবদান রাখেন ইবনে খারদাজবা, শরীফ ইদ্রীসী, আবূ আলী আল মারাকেশী, আলী ইবনে ওমর আল-কাতেবী, কুতুবুদ্দীন আসসিরাজী, আবুল ফারয আলী, আল-বিরুনী, আল-মাসঊদী, মুহিউদ্দীন বিরি-রঈস প্রমুখ মুসলিম মনীষী। এ সকল মনীষী কোপার্নিকাস Nicolaus Copernicus[১৫]

৭. আব্দুল্লাহ মাশুখী, মাওকিফুল ইসলাম ওয়াল কানিসা; পৃষ্ঠা ৫৯।

৮. আত-তাকমিলাহ লিকিতাবিস্ সিলাহ ১/১৯০।

৯. আমের নাজ্জার, তারীখুত তিব্বি ফিদ দাওলাতিল ইসলামিয়্যাহ; পৃষ্ঠা ১৩৩।

১০. মাহমুদ কাসেম, আত-তিব্বু ইনদাল আরব; পৃষ্ঠা ১৪৮।

১১. ইবনে সিনা, আল-কানুন ৩/১৬৫।

১২. গুস্তাভলি ভন, হাযারাতুল আরব; পৃষ্ঠা ৫৯১।

১৩. সনাতন গণিতশাস্ত্রে স্থানাঙ্ক জ্যামিতি একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। অনেক সময় একে বিশ্লেষণাত্মক জ্যামিতিও বলা হয়। এটি সাধারণত কো-অর্ডিনেট জ্যামিতি বা কার্টেসিয়ান জ্যামিতি নামে পরিচিত।

১৪. তুরাসুল ইসলাম; পৃষ্ঠা ৫৬৩।

১৫. বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপার্নিকাসের (১৪৭৩-১৫৪৩) জন্ম পোল্যান্ডের থর্ন শহরে। তিনি ছিলেন একাধারে গণিতবিদ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, পদার্থবিজ্ঞানী, গভর্নর, কূটনীতিক ও অর্থনীতিবিদ। পৃথিবীসহ অন্যন্য গ্রহগুলো সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে, এ

(জন্মঃ ১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দ, মৃত্যুঃ ১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দ)-এর আগেই 'পৃথিবীর গোলাকার তত্ত্ব' আবিষ্কার করেন। পৃথিবীর মানচিত্রে দ্রাঘিমাংশ ও অক্ষাংশের আবিষ্কার করেন। ক্রিস্টোফার কলম্বাস Christopher Columbus (জন্মঃ ১৪৫১ খ্রিস্টাব্দ-মৃত্যুঃ ১৫০৬ খ্রিস্টাব্দ)-এর অনেক পূর্বেই তারা আমেরিকা আবিষ্কার করেন।[১৬] কুমেরুতে ষষ্ঠ মহাদেশ আবিষ্কার করেন।[১৭] এমনকি ভাস্কো দা গামা'র পূর্বেই স্পেন থেকে ভারত রুটের আবিষ্কারও মুসলিমদের অবদান।[১৮]

জোতির্বিজ্ঞানে অবদান রাখেন 'মুসা ইবনে শাকের এর সন্তানত্রয়, নাসীরুদ্দীন তুসী, ইবনে ইউনুস, ফারগানী, বাত্তানী, আব্দুর রহমান সূফী, আবুল ওফা বুযাজানী, আবূ ইসহাক আন্‌নাক্কাশ, আবুল য়ূসর খিরাকী, বাদী আল উস্তুরলাবী, ইবনুশ্‌শাতের, উলুগবেগ, শামসুদ্দীন রুদানী প্রমুখ মনীষী। জ্যোতির্বিদ্যার গবেষণার জন্য মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে নির্মিত হয় অনেক মানমন্দির। মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ নক্ষত্রের হিসাবের জন্য পঞ্জিকা তৈরি করেন। এছাড়াও বহু সংখ্যক তারকার স্থান চিহ্নিত করেন। চন্দ্র ও চলমান নক্ষত্রের কতক গতিবিধি সংশোধন করেন। সৌরবর্ষের দৈর্ঘ্য সংশোধন করেন। এছাড়াও মানমন্দিরে জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যেমন এস্ট্রোল্যাব ইত্যাদি আবিষ্কার করেন।

রসায়ন শাস্ত্রে অবদান রাখেন খালিদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে মুয়াবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান, জাবির ইবনে হাইয়ান, ইমাম রাযী রহ. প্রমুখ। তাদের আবিষ্কারের মধ্যে অন্যতম হলো নাইট্রিক এসিড (Nitric acid), সালফিউরিক এসিড (Sulfuric acid), নাইট্রো-হাইড্রোক্লোরিক এসিড (Nitrohydro-chloric acid), সিলভারনাইট্রেট (Silver nitrate), মারকিউরি ক্লোরাইড (Mercury chloride), মারকিউরি অক্সাইড, (Mercury oxide). পটাসিয়াম কার্বোনেট (Potassium carbonate), সোডিয়াম কার্বোনেট (Sodium carbonate), আয়রন সালফেট (Iron sulfate) ইত্যাদি। এছাড়াও তারা সুরমা (Surma), পটাশ (Potash), আমোনিয়া (Ammonia), আর্সেনিক (Arsenic), অ্যান্টিমোনি (Antimony), আল-কালাই (Alkali) যা ইউরোপে তার আরবী নামের সাথেই প্রবেশ করেছে ইত্যাদি।[১৯]

ফার্মেসি তথা ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার-বিজ্ঞানে অবদান রাখেন রশীদুদ্দীন সুরী, ইবনে বাইতার, ইমাম রাযী, আল-বিরুনী', আলী ইবনে আব্বাস, ইবনে সিনা, আবুল কাসেম খালাফ ইবনে আব্বাস, ইবনে যাহ্‌র আন্দালুসী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইদ্রীসী , আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ গাফেকী, আল্লামা কিন্দী প্রমুখ। Dr. Gustave Le Bon বলেন, 'কোনো ধরনের কষ্ট-ক্লেশ ছাড়াই আমরা 'ফার্মেসি'কে মুসলিমদের দিকে সম্পৃক্ত করতে পারি এবং বলতে পারি যে, 'ফার্মেসি' মূলত আরবদের আবিষ্কার।[২০]

ভূ-বিজ্ঞানে অবদান রাখেন ইখওয়ানুস-সাফা, কাযবীনী, উতারিদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-হাসিব, ইবনে সীনা, মাসউদী, মাকদীসী, আবুল ফিদা, আল-বিরুনী প্রমুখ মনীষীগণ। তারা ভূমিকম্প, খনিজ, শিলা-পাথর, সমুদ্র, জোয়ার-ভাটা, ভৌগলিক উঁচু-নিচু খাঁজসমূহ প্রভৃতি বিষয়ে সর্বপ্রথম সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করেন। যন্ত্র প্রকৌশল বিদ্যায় অবদান রাখেন মুসলিম প্রকৌশলবিদ মূসা ইবনে শাকেরের তিন সন্তান, বাদিউযযামান আল-যাজারী, তাকিউদ্দীন দিমাশকী প্রমুখ মনীষীগণ। এ সকল মনীষী ইউরোপের পাঁচশত বছর আগেই তারা ক্র্যাঙ্কশ্যাফট আবিষ্কার করেন। তাদের আবিষ্কারের মধ্যে আরো ছিলো এস্ট্রোল্যাব, চাষাবাদ ও কৃষিকার্যের জন্য বিশেষ ধরনের মেশিন, বিভিন্ন ডিজাইনের ঘড়ি, স্বয়ংক্রিয় ভারোত্তলন যন্ত্র, ছয় সিলিন্ডার বিশিষ্ট পানির পাম্প ইত্যাদি।

উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও মুসলিম মনীষীগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের জানা-অজানা আরো অনেক ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। পূর্ববর্তী জাতি-সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও উৎকর্ষ সাধনের পাশাপাশি নতুন জ্ঞানের অনেক ধারাও তারা আবিষ্কার করেছেন। এ কারণে Prof. Joseph Hell বলেন, 'মানবজাতির ইতিহাসে স্বীয় ছাপ মুদ্রিত করা সব ধর্মেরই প্রধান বৈশিষ্ট্য। .... কিন্তু ইসলাম যতোটা দ্রুতবেগে ও অকপটভাবে বিশ্বমানবের হৃদয় স্পর্শকারী মহাপরিবর্তন সাধন করেছে, জগতের অন্য কোন ধর্ম তা পারেনি।'[২১] ঐতিহাসিক O.J. Thatcher বলেন, 'পয়গম্বর মুহাম্মাদের মৃত্যুর পর পাঁচশ বছর তাঁর অনুগামীরা এমন এক সভ্যতার পত্তন ঘটায়, যা ইউরোপের সব কিছু থেকে বহু গুণ অগ্রগামী।[২২] লিওনার্দো লিখেছেন, 'আরবদের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর সভ্যতা, জ্ঞানচর্চা, সামাজিক ও মানসিক সমৃদ্ধি এবং অভ্রান্ত শিক্ষাপ্রথা বিদ্যমান না থাকলে ইউরোপকে আজও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমগ্ন থাকতে হতো।'[২৩]

মুসলিমদের সোনালী যুগের গৌরবময় ইতিহাসের আলোকে এবং সত্যাশ্রয়ী পশ্চিমা দার্শনিকদের ইতিহাসনির্ভর প্রামাণ্য উক্তিতে এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মানবসভ্যতা এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পৃথিবী ইসলাম ও মুসলিমদের নিকট এতটা ঋণী হয়ে আছে যে, সভ্যতার দাবীদার আধুনিক প্রযুক্তির বিশ্ব সে ঋণ কখনোই শোধ করতে পারবে না! কাজেই মুসলিম জাতিকে পশ্চাৎপদ এবং সেকেলে বলে সম্বোধন করা এবং তাদেরকে স্থবিরতা ও বর্বরতা এবং সন্ত্রাসবাদ ও হিংস্রতার দোষে দুষ্ট করা নিতান্তই অন্যায় এবং মিথ্যা অপবাদমাত্র! পাশাপাশি উল্লিখিত প্রামাণ্য আলোচনার ভিত্তিতে একজন সচেতন মুসলিমের জন্য বিশেষত মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য উচিত হলো, ইসলামের প্রতি বিশ্বস্ততা, আস্থা, নিয়মানুবর্তিতা এবং দায়বদ্ধতায় বিশ্বাসী হওয়া এবং নিষ্ক্রিয়তা, নির্জীবতা ও হীনম্মন্যতার শৃংখল ভেঙে সকল মানবসম্প্রদায়কে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আহ্বানে দৃঢ় মানসিকতার অধিকারী হওয়া। তদ্রুপ আবশ্যক হলো, দীনী শিক্ষাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়ার পাশাপাশি মানবসেবা, ইসলাম ও মুসলিমদের স্বকীয়তা রক্ষা এবং কুফর ও ধর্মহীনতার বিরুদ্ধে ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে পাশ্চাত্যের অপসংস্কৃতি, নাস্তিকতা, অশ্লীলতা ও অহেতুক বিষয়ে কর্মব্যস্ততা থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামের রঙে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার ব্যাপারে জাতিগতভাবে সচেতন হওয়া। আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন।

লেখক পরিচিতি: শিক্ষক: জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

মতবাদ প্রথম জোরালোভাবে উপস্থাপন করেন তিনিই। কোপার্নিকাস বলেন, 'সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘুরে বলে ঋতু পরিবর্তন হয়। আর পৃথিবী তার নিজ অক্ষের উপর আবর্তিত হয় বলেই দিন-রাত্রি হয়।' [৯ম ও ১০ম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান বইয়ে নিকোলাস কোপার্নিকাসের কথা উল্লেখ আছে]

১৬. আব্দুর রহমান হুমাইদাহ, আ'লামুল যুগরাফিয়্যীন আল-আরব; পৃষ্ঠা ২২৫।

১৭. আরাবাতুল আলিহাহ; পৃষ্ঠা ২৯।

১৮. তারীখুল আদাবিল যুগরাফি আল-আরাবী ২/৫৬৩।

১৯. ডোনাল্ড হিল, আল-উলূমু ওয়াল হানদাসাতু ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যাহ; পৃষ্ঠা ১২০।

২০. গুস্তাভলি ভন, হাযারাতুল আরব; পৃষ্ঠা ৪৯৪।

২১. S. Khuda Bakhsh. M.A. BCL. Bar-at-Law প্রণীত Arab civilization; পৃষ্ঠা ১৬।

২২. general History of Europe, Vol-1, Page-172

২৩. Thatcher, and F. Schwill, 'A General History of Europe', Vol-1, Page 174-188.

======================

(১২ পৃষ্ঠার পর; আল্লামা আহমাদ শফী রহ.)

হঠাৎ ১৭/০৯/২০২০ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে শাইখ রহ.-এর শারীরিক অবস্থা অবনতির দিকে ধাবিত হলে রাতে জরুরী ভিত্তিতে শাইখ রহ. কে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিউতে ভর্তি করা হয়। পরের দিন ১৮/০৯/২০২০ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার বিকেলে উন্নত চিকিৎসার জন্য শাইখ রহ.-কে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সযোগে ঢাকার ধুপখোলা মাঠ সংলগ্ন আজগর আলী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আহ! সেদিন সন্ধ্যায় আজগর আলী হাসপাতালে পৌছার পর ৬ টা ২০ মিনিটে শায়খ রহ. ৯১ বছর বয়সে প্রিয় প্রতিষ্ঠান এবং মুসলিম উম্মাহকে 'আল-বিদা' জানিয়ে চিরস্থায়ী সুখময় জীবনের মুসাফির হয়ে যান (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আল্লাহ তা'আলা হযরত রহ.-এর উপর রহম করুন, তাঁর ভুল ত্রুটি ক্ষমা করুন, জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুন তার পরিবার-পরিজন, আত্মীয়–স্বজন, ছাত্র এবং ভক্তবৃন্দ সকলকে ছবরে জামিল দান করুন (আমিন)।

একদিকে পৃথিবীর ক্লান্ত সূর্য উদয়ের বার্তা দিয়ে পশ্চিমাকাশে ডুবে গেল, অন্যদিকে ইলমে নববীর এ ক্লান্ত সূর্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হয়ে গেল।

অবিস্মরণীয় জানাযা

শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফী রহ.-এর জানাযাকে কেন্দ্র করে হাটহাজারী উপজেলায় হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। হাটহাজারী মাদরাসার দিকে লাখো মানুষের ঢল নামে। প্রচণ্ড রোদ আর গরমের তীব্রতা উপেক্ষা করে প্রাণপ্রিয় মানুষটিকে একনজর দেখার জন্য ও শেষ বিদায় দেয়ার জন্য ছুটে আসেন লক্ষ লক্ষ তৌহিদী জনতা। তারা চোখের জলে একাকার হয়েছেন; তবুও সিক্ত করেছেন হযরত রহ.-কে এক অভাবনীয় অভূতপূর্ব ভালোবাসায়!

জানাযায় শরীক হতে আসা সবাই জানাযা শেষে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে যান। উপস্থিতির সংখ্যা ছিল বর্ণনাতীত। কয়েক কিলোমিটার এলাকা ছিল লোকে লোকারণ্য! ভিড়ের কারণে পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রশাসন পুরো হাটহাজারীর সব প্রবেশপথে যানচলাচল বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। জানাযা শেষে তাকে হাটহাজারী মাদরাসা ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে বাইতুল আতিক জামে মসজিদ সংলগ্ন মাকবারায়ে জামি'আয় দাফন করা হয়। দেশী ও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় এটিকে বাংলাদেশের স্মরণকালের সর্ববৃহৎ জানাযা বলে অভিহিত করা হয়।

মুসলিমবিশ্বের বিশিষ্ট উলামায়ে কেরামের তাযিয়াত ও বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের শোকবার্তা

শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফী রহ.-এর ইন্তিকালে উপমহাদেশ ও মুসলিম বিশ্বের বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম, রাজনীতিবিদ, সরকারপ্রধান ও সুশীল সমাজ শোক প্রকাশ করেছেন এবং শোকবার্তা পাঠিয়েছেন। ড. আল্লামা ইউসুফ কারযাভী হাফিযাহুল্লাহ, আল্লামা মুফতী তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ, মাওলানা রাবে হাসান নদবী হাফিযাহুল্লাহ, ড. আলী মুহাম্মদ আলী সাল্লাবী হাফিযাহুল্লাহ, ড. ওয়াসী আবূ যায়েদ হাফিযাহুল্লাহ, মাওলানা আরশাদ মাদানী হাফিযাহুল্লাহ, ড. আকরাম নদবী হাফিযাহুল্লাহ ও ড. আলী ফরাজী হাফিযাহুল্লাহ-সহ বিশ্বের বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম শোকবার্তা পাঠিয়েছেন।

এছাড়াও শোকবার্তা পাঠিয়েছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীপরিষদ ও বাংলাদেশ পুলিশের আইজিপিসহ বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীগণ।

লেখক পরিচিতি: বিশিষ্ট লেখক ও সিনিয়র মুহাদ্দিস, দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

مركز القرآن محمدفور ڈھاکا

মারকাযুল কুরআন মুহাম্মদপুর ঢাকা

শতভাগ মানুষের কাছে কুরআনের আলো পৌঁছানোর লক্ষ্যে

বাড়ি নং-৩৪, রোড নং-১
(বাঁশের পুলের পশ্চিমপার্শ্ব সংলগ্ন)
স্বপ্নধারা হাউজিং, বসিলা রোড
মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

আবাসিক / অনাবাসিক

বিভাগসমূহ

- সুশৃঙ্খল মকতব বিভাগ
- আদর্শ নাযেরা বিভাগ
- মানসম্পন্ন হিফয বিভাগ
- আল-আবরার ইসলামিক একাডেমী
- নৈশ বিভাগ

ভর্তি চলছে

আসন সংখ্যা সীমিত

মাদরাসার বৈশিষ্ট্যসমূহ

সার্বক্ষণিক সিসি ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

★ পরিপূর্ণ নিরাপত্তা, একান্ত নিরিবিলি ও মনোরম পরিবেশে শিক্ষাদান
★ অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর মাধ্যমে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে পাঠদান
★ কর্মব্যস্ত অভিভাবকদের সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণ
★ স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পরিবেশন ও শরীরচর্চার ব্যবস্থা
★ এতীম, অসহায়, অসচ্ছল মেধাবী ছাত্রদের জন্য বিশেষ সুবিধা

পরিচালক ঃ
হাফেয মাওলানা মুফতী আব্দুল লতীফ দাঃ বাঃ
মোবাইল ঃ ০১৯২৪৭৩৮৪৪১, ০১৯৭৪৭৩৮৪৪১

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী দা.বা.
সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা
ইমাম ও খতীব, বাইতুস সুজূদ জামে মসজিদ, ঢাকা

শ্রেষ্ঠ যিনি অন্দরে শ্রেষ্ঠ তিনি অন্তরে

মাওলানা ওবায়েদ আহমাদ

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'সর্বশ্রেষ্ঠ ঐ ব্যক্তি, যিনি পরিবারের লোকদের নিকট শ্রেষ্ঠ আর আমি আমার পরিবারের নিকট শ্রেষ্ঠ।' (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৭৮৯৫)

মানবশিশুর সবচে নিরাপদ আশ্রয় একটি পরিবার। বেড়ে উঠার শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়। নবীজীর উক্ত ইরশাদ যতটা ভূমিকা পালন করে চলছে একটি আদর্শ পরিবার গঠনে তেমনি নবীজী উম্মতের সামনে আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন একটি আর্দশ পরিবার। মসজিদে নববীর পাশেই ছোট্ট করে গড়ে ওঠা কতগুলো মাটির ঘর। খেজুরের ডালপালা দিয়ে নির্মিত ছাদ। বৃষ্টি থেকে রক্ষা পেতে কম্বল দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে পুরোটা। মানুষ সমান উচ্চতা আর দুজনের কোনোমতে রাত কাটানোর ব্যবস্থা। পর্দা হিসেবে দরজার উপর ঝুলানো মোটা কম্বল। ঘরের এক কোণে নামসর্বস্ব খাট, বিছানো খেজুর পাতার মাদুর, খেজুর-ছালের বালিশ, পানি মজুদ রাখার একটি মটকা, মাটির পানপাত্র আর তেলের অভাবে অচল হয়ে পড়ে থাকা মাটির প্রদীপ।

হযরত আয়েশা রাযি.-এর বর্ণনায় চিত্রিত হয়েছে স্বীয় ঘরের এ করুণ কাহিনী। তিনি ভাগ্নে উরওয়াকে উদ্দেশ্য করে বলছিলেন, হে আমার প্রিয় ভাগ্নে, আমরা পরপর তিনটি চাঁদের উদয়-অস্ত দেখতাম। এভাবে কেটে যেতো দুই মাস। অথচ নবীজীর ছোট্ট ঘরগুলোতে চুলা ধরাবার মত কোনো ব্যবস্থা হতো না। ভাগ্নে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে আপনাদের দিন কাটতো কিভাবে? তিনি বললেন, কৃষ্ণ দুটি খাদ্য বস্তু; খেজুর আর পানিই ছিলো আমাদের একমাত্র সম্বল। তাছাড়া নবীজীর আনসারী প্রতিবেশীদের বকরীর দুধও হাদিয়া হিসেবে আসলে আমরা সেগুলো পান করতাম। (সহীহ বুখারী; হা.নং ২৫৬৭)

বর্ণিত এই চিত্রগুলো সাহাবাদের কতটা বিষণ্ন করতো সেটা জানা যায় নবীজীর প্রিয় শাগরেদ হযরত আবু হুরাইরা রাযি.-র যবানীতে। তিনি বলেন– একবার আমি নবীজীর দরবারে আসলাম। নবীজী তখন বসে বসে সালাত আদায় করছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ব্যাপার কি, আপনি বসে সালাত আদায় করছেন? নবীজী বললেন, হে আবু হুরায়রা! অনাহারের কষ্টে। নবীজীর কথা শুনে আমি নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে কেঁদে ফেললাম। নবীজী সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, হে আবূ হুরায়রা! দুঃখ করো না। বিচার দিবসের হিসাব কিতাবের জটিলতা ঐ ক্ষুধার্ত মানুষকে স্পর্শ করতে পারে না, যে দুনিয়াতে ক্ষুধার্ত অবস্থায় তার প্রভুর নিকট সওয়াবের প্রত্যাশা রেখেছে। (শু'আবুল ঈমান; হা.নং ৯৯৪০)

এই ছিলেন আমাদের নবীজী। অনাড়ম্বর এই জীবন যাপনে নবীজী গড়ে তুলেছিলেন একটি শ্রেষ্ঠ পরিবার। উপহার দিয়েছিলেন শ্রেষ্ঠ জাতি। দুঃসময়ের দুঃখগুলো লালন করে নিজের মমতাটুকু উজাড় করে গড়ে তুলেছিলেন প্রিয় খাদেম আনাসকে, কলিজার টুকরো ফাতেমাকে, প্রিয়তমা আয়েশাকে। মহানুভব নবীজীর স্পর্শধন্য আনাসের অনুভূতি শোনা যাক তাঁর মুখ থেকেই- সবেমাত্র আমি দশে পা দিয়েছি। শুনলাম মদীনায় কে যেনো এসেছেন। আমার মা আমাকে নিয়ে তাঁর কাছে ছুটে গেলেন। আবেগমাখা কণ্ঠে অনুরোধ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মদীনার আনসাররা কতজন কতকিছু আপনার কাছে তোহফা হিসেবে পেশ করে। আদরের প্রিয় আনাস ছাড়া আপনার কাছে হাদিয়া হিসেবে পেশ করার মত আমার কাছে কিছু নেই। অনুগ্রহপূর্বক গ্রহণ করুন। সে আমৃত্যু আপনার খেদমত করে যাবে। তখন থেকেই আমি দীর্ঘ দশ বছর হযরতের খেদমত করেছি। তিনি এই দীর্ঘ দশ বছরে কখনো আমাকে মারপিট করেননি, গালিও দেননি এবং আমার কোনো কাজে বিরক্তিভাব ফুটিয়ে চেহারা ফিরিয়েও নেননি। ঘরে-সফরে যেখানেই তার সাথে গিয়েছি কোনো কাজ করে ফেললে কখনো জিজ্ঞাসা করতেন না, এটা কেনো করলে? আবার কোনো কাজ না করলে জানতেও চাইতেন না, কাজটি কেনো করোনি? পরিবারের কেউ আমার কোনো কাজে ভুল ধরলে নবীজী বলতেন, তাকে তার কাজ করতে দাও। তাকদীরে যা হওয়ার ছিলো তা হয়ে গেছে। (সুনানে তিরমিযী ; হা.নং ৫৮৯, ২৬৭৮)

নবীজী আমার জন্য দু'আ করেছিলেন, হে আল্লাহ, আপনি তার ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততিতে বরকত দান করুন,হায়াতকে বাড়িয়ে দিন এবং তাকে মাগফেরাত দান করুন। তিনি আমার জন্য তিনটি দু'আ করেছেন। ইতোমধ্যে আমি একশো তিনজনকে দাফন করেছি। বছরে দুইবার আমার বাগানে ফল আসে। আমার হায়াত বেশি দীর্ঘ হওয়ার ফলে আমি এখন মানুষের সাথে উঠাবসায় সংকোচবোধ করি এবং মাগফিরাতের ব্যাপারে আমি আশাবাদী। (আল-আদাবুল মুফরাদ; হা.নং ৬৫৩)

নবীজীর গুণমুগ্ধ খাদেম হযরত আনাস রাযি. শেষে বলেই ফেললেন, জগতের তামাম বনী আদমের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বোত্তম গুনাবলীতে পরিপূর্ণ একজন মানুষ।

কলিজার টুকরা ফাতেমাও বেড়ে উঠেছেন নবীজীর আদর্শে। অসচ্ছল পিতার দুনিয়াবিমুখতা এতটুকুও বিচলিত করেনি তাকে। নবীজীবনের শুরু থেকে শেষ। পিতার পাশে থেকেছেন গুণবতী কন্যার মতো। বাবার প্রতি স্বভাবজাত অভিমান আর দাম্ভিকতার বদলে আপন মহিমায় তিনি উদ্ভাসিত হয়েছেন মহিয়সী আর এক আত্নত্যাগী নারী হিসেবে। নববী পরিচর্যায় বেড়ে উঠা একসময়ের শ্রেষ্ঠ মনীষার মর্মস্পর্শী ঘটনাগুলো আজও মুসলিম মা-বোনদের জন্য অনুপম এক দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। আমরা নবীকন্যা ফাতেমার কিছু ঘটনা তার সৎ মা হযরত আয়েশা রাযি. থেকে জেনেছি । বিমাতার বর্ণণায় ফুটে উঠেছে ফাতেমা রাযি.-র সাথে নবীজীর ঘনিষ্ঠ সখ্যতার চিত্র।

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, ফাতেমা একদিন নবীজীর কাছে আসলেন। আর তিনি অবিকল নবীজীর মতো করে হাঁটতেন। তখন নবীজী তাকে স্বাগত জানালেন এবং ডানপাশে বসালেন। কানে কানে কি যেনো বলতেই ফাতেমা রাযি. চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। আবারো নবীজী কানে কানে কি যেনো বললেন। তিনি এবার হেসে উঠলেন। আমি অবাক হলাম। এমন আজব দৃশ্য তো কখনো দেখিনি এই কাঁদলেন পরক্ষণেই আবার হেসে দিলেন। আমি এর রহস্য জানতে চাইলে তিনি বললেন,

নবীজীর জীবদ্দশায় এই রহস্য উন্মোচন করতে পারবো না। নবীজীর ওফাতের পর রহস্যটি পুনরায় জানতে চাইলে তিনি বললেন, নবীজী আমাকে তখন এ কথা বলেছিলেন যে, জিবরীল প্রতি বছর কুরআন দাওর করার জন্য একবার আগমন করেন। এ বছর তিনি দুইবার আগমন করেছেন। আমি বুঝলাম যে, আমার ওফাতের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আর পরিবারের লোকদের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমি আমার সাথে মিলিত হবে (তুমি সর্বপ্রথম ইন্তেকাল করবে)। তোমার পূর্বসূরীদের মধ্যে আদর্শবান হিসেবে আমি তোমার জন্য উত্তম। এ কথা শুনে আমি কাঁদতে শুরু করলাম। পরক্ষণেই নবীজী আমাকে সান্তনা দিয়ে বললেন, তুমি কি এতে আনন্দিত নও যে, জান্নাতে তুমি জগতের নারীদের সর্দার হবে? এ কথা শুনে আমি হেসেছি। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৬২৩)

অন্য এক সাহাবী হযরত ছাওবান রাযি.-এর বর্ণনায় এসেছে, নবীজী কোনো সফরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে সর্বশেষ ফাতেমা রাযি.-র কাছ থেকে বিদায় নিতেন। আবার যখন ফিরে আসতেন প্রথমেই ফাতেমা রাযি.-এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৪২১৩)

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ফাতেমা আমার কলিজার টুকরা। যে তাকে কষ্ট দেয় সে যেনো আমাকেই অসন্তুষ্ট করে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৭১৪)

প্রাণাধিক প্রিয় কন্যা ফাতেমার বিবাহের জন্য যখন চতুর্দিক থেকে প্রস্তাব এলো। নবীজী ভেবেচিন্তে নিঃস্বপ্রায় বীর বাহাদুর আলীর হাতে নিজ কন্যাকে সোপর্দ করলেন। মোহর প্রসঙ্গে নবীজী আলী রাযি.-এর সামর্থ্যের কথা জানতে চাইলে তিনি মোহর পরিশোধে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার ঐ বর্মটি কোথায় যা তুমি বদর যুদ্ধে গণীমত হিসেবে তোমার হস্তগত হয়েছিলো? হযরত আলী রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সেটার দাম তো মোটে চারশো দিরহাম। (সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকী; হা.নং ১৪৩৫১) এভাবেই নবীকন্যা ফাতেমা রাযি.-এর সাদামাটা বিবাহ সম্পন্ন হলো ।

সংসার জীবনে টুকটাক গোল বাধবেই। এ সংসারেও টুকটাক ঝামেলা হলে নবীজী দুজনের মাঝে মীমাংসা করে দিতেন। হযরত সাহল বিন সাআদ থেকে বর্ণিত, একবার নবীজী ফাতেমার ঘরে এসে দেখলেন আলী রাযি. নেই। জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার ফাতেমা, তোমার চাচাতো ভাই কোথায়? ফাতেমা বললেন, তাঁর সাথে আমার একটু সমস্যা হয়েছে। তিনি রাগ করে ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছেন। আমাকে কিছু বলে যাননি। নবীজী তার খোঁজে লোক পাঠিয়ে জানতে পারলেন, তিনি মসজিদে অবস্থান করছেন। নবীজী মসজিদে গিয়ে দেখতে পেলেন, হযরত আলী রাযি. মসজিদে মাটিমাখা হয়ে শুয়ে আছেন। পরিহিত চাদরের একাংশ গড়িয়ে পড়েছে মাটিতে। ধূলোমলিন আলীর গা ছুঁয়ে নবীজী কোমল গলায় বললেন, হে আবু তোরাব! উঠো। নবীজীর কোমল আদেশকে উপেক্ষা করার সাধ্য কি কারো আছে? (সহীহ বুখারী; হা.নং ৪৪১)

সংসার জীবনে ফাতেমা রাযি. ছিলেন একজন কর্মঠ ও কষ্টসহিষ্ণু নারী। এক হাতেই তিনি সংসার সামলাতেন। না ছিলো কোনো সেবাদাসী আর না ছিলো কোনো ঘরের সেবক। অভাবের সংসারের কিঞ্চিৎ তুলে ধরলেন খোদ আলী রাযি. আর কিছুটা হযরত ফাতেমা রাযি.। হযরত আলী রাযি. বলেন, ফাতেমার সাথে বিবাহের পরে তিনি একটি চাদর, উলভর্তি একটি চামড়ার বালিশ, দুটি যাঁতা আর দুটি পানপাত্র নিয়ে বাবার বাড়ি থেকে এসেছিলেন। একদিন আমি ফাতেমাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, কূপ থেকে কষ্ট করে বালতি দিয়ে তোমার পানি উঠানো আমাকে খুব পীড়া দেয়। নবীজীর দরবারে তো অনেক বন্দী আছে, নবীজীর কাছে একজন খাদেমের আবেদন করো।

এবার হযরত ফাতেমা রাযি. পরবর্তী ঘটনা বলতে শুরু করলেন, "সে সময় যাঁতা দিয়ে আটা পিষতে পিষতে আমার হাত ফুলে ফোস্কা পড়ে গিয়েছিলো। তাই আমি নবীজীর দরবারে গেলাম। নবীজী বললেন, প্রিয় বেটি! কি খবর নিয়ে এসেছো? বললাম, আপনার সাথে সালাম বিনিময় করতে এসেছি। এ কথা বলে আমি ফিরে আসলাম। সংকোচের কারণে গোলামের বিষয়টি চাপা পড়ে গেলো। অবশেষে আমরা দুজনে আবার নবীজীর দরবারে গেলাম এবং আলী রাযি. পরিবারের অবস্থা সব খুলে বললেন। নবীজী বললেন, খোদার কসম, আমি আহলে সুফ্ফাদের অনাহারে রেখে তোমাদেরকে কোনোকিছু দিতে পারি না। আমি গোলামগুলো বিক্রি করে সমুদয় অর্থ আহলে সুফফার মাঝে বিলিয়ে দিতে চাই। আমরা নবীজীর একথা শুনে ফিরে এলাম।"

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, একদিন নবীজী তাদের ঘরে তাশরীফ রাখলেন। তারা দু'জনে চাদর পরিহিত ছিলেন। তারা পরিপূর্ণভাবে নিজেদেরকে আবৃত করতে পারছিলেন না। মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যেতো, পা ঢাকলে মাথা। পারিবারিক দুরাবস্থার কারণে তাদের মনটা বিষন্ন ছিলো। নবীজী তাদেরকে সান্তনা দিয়ে বললেন, তোমরা যা আবেদন করেছো, তারচে উত্তম বিষয় কি আমি তোমাদের বলে দিবো না? তারা বললো, অবশ্যই বলে দিন। নবীজী বললেন, জিবরীল আলাইহিস সালাম আমাকে এই কালিমাগুলো শিখিয়েছেন; প্রত্যেক নামাযের পর ১০ বার সুবহানাল্লাহ, ১০ বার আলহামদুলিল্লাহ আর ১০ বার আল্লাহু আকবার। আর যখন বিছানায় যাবে তখন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ, ৩৪ বার আল্লাহু আকবার।

হযরত আলী রাযি. হাদীসটি বর্ণণা করে বলেন, আল্লাহর কসম, যেদিন থেকে উক্ত কালিমাগুলো আমি নবীজী থেকে শিখেছি সেদিন থেকে কোনোদিন আমার এই হাদীসের উপর আমল ছুটে যায়নি। পাশ থেকে একজন সাহাবী জানতে চাইলেন, সিফফীন যুদ্ধের রাতেও কি আপনার এ আমল তরক হয়নি? বললেন, সিফফীনের রাতেও তরক করিনি। (আল ইসাবা ফি তাময়ীযিস সাহাবা- ৮/২৬৫)

পরম যত্নে লালিত কলিজার টুকরা ফাতেমা ফিরে গিয়েছিলেন নিরাশ হয়ে। আশাহত করেননি নবীজী। দুনিয়ার প্রাচুর্যের বদলে তাকে উপহার দিলেন বেহেশতের বাগান। দুনিয়াতে একটু ভালো থাকতে চেয়েছিলেন ফাতেমা। নবীজী তাকে আখিরাতে পরমানন্দে জীবনযাপনের খোঁজ দিয়ে দিলেন। নবীজী প্রাধান্য দিলেন আসহাবুস সুফফাকে। ফিরিয়ে দিলেন নিজ কন্যা ফাতেমাকে। এভাবেই গড়ে উঠেছিলো একটি পরিবার। ক্ষুধা, অনাহার, কষ্ট, অভাব ও দুঃখ-দুদর্শার ভিতর দিয়েও আদর্শ এক বটবৃক্ষে পরিণত হচ্ছিলেন একজন মহিয়সী ।

এমন আত্মত্যাগী নারীকে সুসংবাদ দিয়ে নবীজী বললেন, "অফুরন্ত নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে তুমিই হবে জান্নাতী রমণীদের রানী।"

এমন মহানুভব পিতার মৃত্যুতে যেনো শোকে পাথর হয়ে গেলেন ফাতেমা।

বিষণ্নতায় ছেয়ে যাওয়া দুঃখভরা মন নিয়ে শোকগাঁথা আবৃত্তি করলেন– (অর্থ:)
ব্যাকুল যে হৃদয় সুবাসিত হয় আহমাদেরই ঘ্রাণে/পবিত্র সে সুবাস যুগে যুগে যেনো নাসিকা রন্ধ্রে জাগে।
অবারিত নীল ছেয়ে আছে আজি শোকের অন্ধকারে/মহামুসীবত পর্বত সমান বাবা হারানোর দুঃখে।
তুমি ছিলে আমার শ্যামল যমিন বৃষ্টিস্নাত দিনে/হারিয়ে তোমায় দিশেহারা হায় ওহীর বরকত বিনে।
মরণ কেনো হয়নি আমার তোমার মৃত্যুক্ষণে/দুঃখের সাগর বইছে দেখো তোমার আমার মাঝে।
(মুজামু আ'লামী শুআরায়ীল মাদহীন-নববী; পৃষ্ঠা ২৮০)
অবশেষে নবীজীর ইন্তেকালের ৬ মাস পর হযরত ফাতেমা রাযি. চিরদিনের মতো এই নশ্বর জগত ত্যাগ করে প্রিয় পিতার সান্নিধ্যে চলে গেলেন।
বিমাতা হযরত আয়েশা রাযি. অবশেষে মুখ খুললেন। পাঁচ বছরের বড় সৎ মেয়ের প্রতি হৃদয়ের ভালবাসা উজাড় করে দিয়ে মন্তব্য করলেন, "এ জগতে নবীজীর পর ফাতেমার চে' শ্রেষ্ঠ আমি আর কাউকে দেখিনি।"
নবীপরিবারের অন্যতম সদস্য প্রিয়নবীর প্রিয়তমা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি.। নবীজীর সাথে ছায়াসঙ্গিনী হয়ে কাটিয়েছেন জীবনের দশটি বসন্ত। কত প্রেমময় ভালোবাসা আর আবেগমাখা সুখ দুঃখ দিয়ে ভরে উঠেছিলো তাদের জীবন। সেই ঘটনার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, খাদীজা রাযি.-এর ইন্তেকালের তিন বছর পর নবুওয়াতের দশম বছর শাওয়াল মাসে নবীজীর সাথে আমার বিয়ে হয়। তখন আমার বয়স ছয় বছর। নবীজীর সাথে ঘর সংসার শুরু হয় নয় বছর বয়সে। সখীদের সাথে খেলাধূলা করতে পছন্দ করতাম। একবার আমি খেলাধূলা করছিলাম। তখন নবীজী ঘরে তাশরীফ রাখলেন। একটি খেলনার দিকে ইঙ্গিত করে নবীজী বললেন, হে আয়েশা, এটা কি? আমি (খেলাচ্ছলে) বললাম, সুলাইমানের ঘোড়া। নবীজী আমার উত্তর শুনে হেসে দিলেন।
নবীজী আমার বাবার সাথে আগেই মদীনার উদ্দেশ্যে হিজরত করেছিলেন। হিজরতের কিছুদিন পর তিনি আমাদেরকে মদীনায় নিয়ে আসার জন্য যায়েদ বিন হারেস ও আবু রাফেকে দুটি বাহনজন্তু ও পাঁচশ দেরহাম দিয়ে মক্কায় পাঠালেন। আমার বাবাও তাদের সাথে আব্দুল্লাহ ইবনে উরাইকিতকে আরো দুটি বাহনজন্তু দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন এবং তার হাতে একটি চিঠি দিয়ে আমার ভাই আব্দুল্লাহর নিকট পৌঁছে দিতে বললেন। চিঠিতে আমার মা উম্মে রুমান, আমি ও আমার বোন আসমাকে মদীনাতে নিয়ে আসার নির্দেশনা ছিলো। আমরা কুদাইদে পৌঁছে পাঁচশো দিরহাম দিয়ে আরো তিনটি বাহনজন্তু ক্রয় করলাম। মদীনায় পৌঁছার পর আমরা বাবার কাছেই থাকতাম। একদিন আমার পিতা নবীজীকে ঘর সংসার শুরু করার কথা জানালে নবীজী মোহর প্রদানের অক্ষমতা প্রকাশ করেন। তখন আমার পিতা নিজেই মোহর আদায় করে দেন এবং নবীজী আমার সাথে ঘর সংসার শুরু করেন।
নবীজীর সাথে হযরত আয়েশা রাযি.-এর মধুময় মুহূর্তগুলোর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, একদিন নবীজী আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে আয়েশা, স্বপ্নে তোমার যিয়ারত আমার দুইবার নসীব হয়েছে। আমি দেখলাম, রেশমী কাপড়ে জড়িয়ে আমার সামনে তোমাকে উপস্থিত করা হয়েছে। আমি কাপড় সরিয়ে তোমাকে দেখতে পেলাম। তখন আমাকে বলা হলো, ইনি হচ্ছেন আপনার বিবি। আমি বললাম, যদি আল্লাহর ইচ্ছা এমনই হয় তবে তিনি সেটা বাস্তবায়ন করবেন। (আত-তাবাকাতুল কুবরা; জীবনী নং ৪১২৮)
নবীজীর সাথে আমি এক সফরে বের হলাম। নবীজী এক জায়গায় যাত্রা বিরতি দিলেন এবং আমাকে বললেন, এসো দৌঁড় প্রতিযোগিতা করি। নবীজীর সাথে দৌঁড় প্রতিযোগিতায় আমি বিজয়ী হলাম। অন্য এক সফরে নবীজীর সাথে আবারো দৌঁড় প্রতিযোগিতা করি। কিন্তু শরীর ভারি হয়ে যাওয়ায় এবার নবীজী আমাকে হারিয়ে দিলেন এবং আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, হে আয়েশা, সেবারের বিজয়ের শোধ হলো এ বিজয়ের মাধ্যমে। (সুনানে আবূ দাঊদ; হা.নং ২৫৭৮)
একবার কোনো এক ঈদে হাবশীরা যুদ্ধ প্রদর্শনীর আয়োজন করলো। নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি খেলাটি দেখতে চাও? আমি আগ্রহ প্রকাশ করলাম। নবীজী আমাকে তার পিছনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। নবীজীর কাঁধের উপর থুতনী রেখে আমি দেখতে শুরু করলাম। তিনি বললেন, ওহে আরফাদার (হাবশীদের একটি গোত্র) লোকেরা, তোমরা প্রদর্শনী শুরু করো। অবশেষে যখন খেলা দেখতে দেখতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন, দেখা কি শেষ হয়েছে? আমি বললাম, জ্বি। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৯৫০)
হায়েয অবস্থায় নবীজী আর আমি একসাথে খানা খেতাম। আমি গোশতের হাড্ডি চুষে নবীজীকে দিতাম। নবীজী সেই স্থানে মুখ দিতেন যেই স্থানে আমি মুখ লাগিয়েছি। আমি পানি পান করে নবীজীকে দিতাম, নবীজী সেই স্থান দিয়ে পানি পান করতেন যেই স্থানে আমি মুখ লাগিয়েছি। (সুনানে আবূ দাঊদ; হা.নং ২৫৯)
মহব্বতের উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছিলেন নবীজী। আমরা আবারো নবীপরিবারের সেই ঘটনাটির কথা স্মরণ করছি, যা হযরত আয়েশা রাযি. প্রিয় ভাগ্নে উরওয়াকে শুনিয়েছিলেন। তিনি বলেন, হে আমার প্রিয় ভাগ্নে, আমরা পর পর তিনটি চাঁদের উদয়-অস্ত দেখতাম। এভাবে কেটে যেতো দুই মাস। অথচ নবীজীর ছোট্ট ঘরগুলোতে চুলা ধরাবার মত কোনো ব্যবস্থা হতো না। ভাগ্নে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে আপনাদের দিন কাটতো কিভাবে? তিনি বললেন, কৃষ্ণ দুটি খাদ্য বস্তু খেজুর আর পানিই ছিলো আমাদের একমাত্র সম্বল। তাছাড়া নবীজীর আনসারী প্রতিবেশীদের বকরীর দুধও হাদিয়া হিসেবে আসলে, আমরা সেগুলো পান করতাম।
অভাবের সংসারে নবীজী জ্বালিয়েছেন মহব্বতের জ্যোতি। একই চিত্র ফাতেমার ঘরে। যেই চিত্রটা এখন আয়েশার ঘরে। নবীজীর দীক্ষাটা ছিলো সবর ও তাহাম্মুলের। নবীজীর শিক্ষাটা ছিলো আখেরাত সঞ্চয়ের। অতিলোভ আর উচ্চাভিলাষী মনোভাবের ঘোরবিরোধী ছিলেন নবীজী। নির্মল আখলাক আর হুসনে খুলুকে ভাঙ্গা ঘরেও যিনি ফুটিয়েছিলেন বসন্তের কলি। সেখানেই বেড়ে উঠেছিলেন আনাস,ফাতেমা আর আয়েশারা। ফলে তিনি উম্মাহকে উপহার দিতে পেরেছিলেন একটি আদর্শ পরিবার।
নবী পরিবারের উম্মাহাতুল মুমিনীনদের পারস্পারিক মহব্বত ছিলো শিক্ষণীয়। এ সম্পর্কে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদীজা রাযি.-এর আলোচনা একটু বেশিই করতেন। এটা আমার আত্মমর্যাদায় আঘাত করতো। একদিন আমি বলেই বসলাম,আপনি কেনো এই থুরথুরে বুড়ি মানুষটাকে এতবেশি স্মরণ করেন? আল্লাহ তো আপনাকে তার বদলে উত্তম বিবিদের দান করেছেন। নবীজী বললেন, আল্লাহ তাআলা তারচে

উত্তম কাউকে বদলা হিসেবে দান করেননি। তিনি তো সর্বপ্রথম আমাকে বিশ্বাস করেছেন, যখন মানুষেরা আমাকে অবিশ্বাস করেছে। তিনি আমাকে সত্যবাদী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, যখন মানুষ আমায় মিথ্যুক ভেবেছে। তিনি তার সমুদয় সম্পত্তি নিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, যখন মানুষেরা আমাকে বয়কট করেছে আর আল্লাহ তাআলা আমাকে তার ঔরসে সন্তান দান করেছেন, যখন আমি অন্যান্য বিবিগণের সন্তান থেকে বঞ্চিত হয়েছি। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২৪৮৬৪)

এই কারণে নবীজী তার স্মরণে বকরী জবাই করে তার বান্ধবীদেরকে গোশত হাদিয়া পাঠাতেন এবং আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে খাদীজা রাযি.-কে জান্নাতে মূল্যবান মোতি দ্বারা নির্মিত সুরম্য প্রাসাদ প্রাপ্তির সুসংবাদ দিয়েছিলেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৮১৬, ৩৮১৭)

তিনি হযরত খাদীজা রা.-এর ত্যাগের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, নবীজী যেদিন হেরাগুহায় সর্বপ্রথম জিবরীল আমীনের সাক্ষাৎ লাভ করেন সেদিন তিনি অজানা শংকায় ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তখন কাঁপছিলেন। খাদীজাকে বললেন, আমাকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে দাও, আমাকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে দাও। অবশেষে নবীজী যখন কিছুটা স্বস্তি অনুভব করলেন তখন খাদীজাকে সব ঘটনা খুলে বললেন এবং নিজের ব্যাপারে অজানা আশংকার কথাও ব্যক্ত করলেন। খাদীজা সেদিন নবীজীকে অভয় দিয়ে বলেছিলেন, খোদার কসম, আল্লাহ আপনাকে কখনোই বিপদে ফেলবেন না। কারণ আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, মানুষের বোঝা বহন করেন, অভাবীদের দুঃখ মোচন করেন, অতিথিদের যথেষ্ট সমাদর করেন এবং সত্যপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত মহান মানুষদের পাশে এসে দাঁড়ান। অতপর খাদীজা নবীজীকে নিয়ে তার চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নাওফালের কাছে গমন করেন এবং সকল ঘটনা খুলে বলেন। তখন ওয়ারাকা নবীজীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, ইনিই হচ্ছেন সেই মহাসত্যের বার্তাদূত, যাকে আল্লাহ তাআলা মূসা আ.-এর নিকট পাঠাতেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৩)

একজন বিবির সামনে অন্য বিবির প্রশংসা আত্মাভিমানে আঘাত করবার মতোই। স্বভাবজাত সেই আত্মাভিমানে যখন আয়েশা রাযি. অনুযোগের সুর তুললেন। নবীজী তখন খাদীজা রাযি.-এর ত্যাগের কথা স্মরণ করে হযরত আয়েশা রাযি.-এর এই অনুযোগে মাখিয়ে দিলেন মহব্বতের মধু। অবশেষে আয়েশা রাযি. নিজেই এই মহিয়সী নারীর ত্যাগের বিবরণ দিয়ে উক্ত হাদীসটি বয়ান করলেন। শিক্ষাটা এখানেই। নবীজীর কোমল সংশোধনকে রুখে দেবার সাধ্য কি কারো আছে! তিনি বিবি আয়েশাকে কটাক্ষ না করে খাদীজা রাযি.-কে স্মরণ করলেন শ্রদ্ধাভরে। তুলে ধরলেন তাঁর জীবনের সংগ্রাম সাধনার নানাদিক। নবীজীর সেই পথ ধরেই যেনো এবার এগিয়ে এলেন হযরত আয়েশা রাযি.। ভক্তিভরে তুলে ধরলেন তার সংগ্রামী জীবনের ইতিকথা।

বিবি খাদীজা রাযি.-এর পরে নবীজী হযরত আয়েশা রাযি.-কে একটু বেশিই ভালোবাসতেন। খোদ হযরত আয়েশাই সেই বিবরণটি দিয়েছেন। তিনি বলেন, নবীজী আমাকে একটু বেশিই মহব্বত করতেন। সাহাবাগণ এটা জানতেন। তাই তারা নবীজীর নৈকট্য লাভের জন্য নবীজী যেদিন আমার ঘরে থাকতেন সেদিন সবাই একটু বেশিই হাদিয়া পাঠাতেন। আমার সতীনরা একদিন উম্মে সালামা রাযি.-এর কাছে সমবেত হয়ে বিষয়টি নবীজীকে অবহিত করার জন্য পাঠালেন। হযরত উম্মে সালামা বিষয়টি নবীজীর সামনে পেশ করে আবেদন জানালেন, মানুষেরা যেনো তাদের সুযোগমত হাদিয়া দেয়। আয়েশাকে কেন্দ্র করে তারা যেনো হাদিয়া না পাঠায়। নবীজী প্রতিউত্তরে কিছু বললেন না। উম্মে সালামা বিষয়টি আবারো বললেন। নবীজী এবারও নিশ্চুপ। উম্মে সালামা তৃতীয়বার পুনরাবৃত্তি করলে নবীজী বললেন, আয়েশার ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দিয়ো না। খোদার কসম, আয়েশার লেহাফে আমার উপর ওহী অবতীর্ণ হয়েছে, যা অন্য কোনো বিবির বেলায় ঘটেনি। উম্মে সালামা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনাকে কষ্ট দেয়া থেকে আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। (আল ইসাবা ফি তাময়ীযিস সাহাবা; জীবনী নং ১১৪৬১)

নবীচরিত্রের এটাই অনুপম দিক। উম্মে সালামার কণ্ঠে যখন অনুযোগ। নবীজী তাকে তিরষ্কার না করে তুলে ধরলেন আয়েশা রাযি.-এর শ্রেষ্ঠত্বের কথা। যেমনটা তিনি তুলে ধরেছিলেন খাদীজা রাযি.-এর ঘটনায়। এভাবেই যেনো নবীজী নির্মাণ করে চলেছেন একেকটি চরিত্র। খাদীজার ঘটনায় শিখেছিলেন হযরত আয়েশা রাযি.। এবার শিখলেন উম্মে সালামা রাযি.। তাইতো অনুযোগের সুর বদলে সেখানে স্থান করে নিয়েছে আয়েশার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা। সেদিকে ইঙ্গিত দিয়েই তো তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে কষ্ট দেয়া থেকে আমি আল্লাহর নিকট পানাহ চাই।

হযরত আয়েশা রাযি.-এর সাথে হযরত যয়নাব রাযি.-এর নবীজীর নিকট প্রিয় হওয়ার প্রতিযোগিতা চলতো। হযরত যয়নাব ছিলেন যথেষ্ট রূপবতী। হযরত আয়েশা রাযি. ছিলেন যথেষ্ট গুণবতী। একবার হযরত আয়েশা রাযি. কে যিনার তোহমত দেয়া হয়েছিলো। পুরো মদীনায় ছড়িয়ে পড়লো এই অপবাদ। মুনাফেকের দল উঠে পড়ে লাগলো অপপ্রচারে। বিভ্রান্ত হলেন গুটিকয়েক সাহাবী। আয়েশা রাযি. দিনরাত শুধু চোখের অশ্রু ফেলেন আর প্রকৃত সত্য উন্মোচন করার জন্য আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানান। একজন অসহায় মহিয়সী নারীর এছাড়া আর কিইবা করার আছে ? একদিন নবীজী বলে ফেললেন, আয়েশা! যদি তোমার কোনো অপরাধ হয়ে থাকে সে জন্য আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করো। প্রিয়'র মুখে এমন কথায় চুরমার হয়ে গেলো হযরত আয়েশা রাযি.-এর দিল। চোখ ফেটে কান্না এলো। কাঁদতে গিয়ে তিনি অনুভব করলেন, চোখের অশ্রু যেনো শুকিয়ে গিয়েছে। এসময় ডাক পড়লো হযরত যয়নাবের। হযরত আয়েশার পবিত্রতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে হবে তাকে। প্রতিদ্বন্দ্বী এই সখীর চরিত্রে হযরত যয়নাব ইচ্ছা করলেই একটুখানি কালিমা লেপন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি যে নবীপরিবারের এক সুবাসিত ফুলের মতোই পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী একজন মহিয়সী। তার মুখে কি শোভনীয়, পবিত্র আত্মায় কালিমা লেপন করার? তাই তিনি তার উচ্চসিত প্রশংসা করে বললেন, আমি তো তাকে উত্তম বলেই জানি। হযরত আয়েশা শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী এই সতীনের দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ানোর কথা স্মরণ করে বলতেন, তিনি তো আমার সাথে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতা করতেন। কিন্তু তার তাকওয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে রক্ষা করেছিলেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ২৬৬১)

নবীজীর সোহবতে হযরত আয়েশা রাযি. পৌঁছে গিয়েছিলেন অনন্য এক উচ্চতায়। নবীজী ইরশাদ করেছেন,

(১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সতর্ক সাইরেন

এনজিওর ফাঁদে বৃহত্তর বেড়িবাঁধ এলাকা

নাইম বিন মাসউদ

সারাদেশে বিশেষত ঢাকা শহরের প্রান্তভাগে এনজিও অপতৎপরতা নতুন কিছু নয়। উলামায়ে কেরাম এবং সচেতন মুসলমান এ বিষয়ে সম্যক অবগত আছেন। উলামায়ে কেরাম জুমু'আর বয়ান-সহ বিভিন্ন মাহফিল-সমাবেশে আলোচনার মাধ্যমে এবং পত্রপত্রিকায় লেখালেখিসহ নানা উপায়ে সাধারণ মানুষকে এনজিওদের ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশল সম্পর্কে অবহিত করছেন। তবে বাস্তবতা হলো, যতোটুকু বলা হচ্ছে এনজিওগুলো তার চেয়েও মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক এজেন্ডা নিয়ে কাজ করছে এবং ধারণাতীত অপকৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে। তারা তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে ইন্টারফেইথ বা সার্বজনীন মানবধর্মের বিষবাষ্প কচিশিশুদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করে দিচ্ছে, যা একজন মানুষকে ধর্মহীন করে দেয়ার জন্য যথেষ্টই বটে।

গাবতলী এলাকার আমিন বাজার থেকে শুরু করে বাবুবাজার পর্যন্ত এলাকা বেড়িবাঁধ এরিয়া হিসেবে পরিচিত। পুরো এরিয়াতে এনজিও কার্যক্রম ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে। সেবা ও শিক্ষার আড়ালে চলছে নাস্তিক্যবাদের পাঠশালা। বেড়িবাঁধ এরিয়ায় এনজিও কার্যক্রমের কিছুটা পাঠকদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরা হলো।

রায়ের বাজার

রায়ের বাজারকে বলা যায় এনজিওর প্রাণকেন্দ্র। এখানে কাজ করছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মিলে প্রায় ২০টি এনজিও। বিশাল এলাকা জুড়ে বস্তি থাকার কারণে খুব সহজে অফিস দেয়া যায়। কখনো একটি বস্তিতেই কয়েকটি এনজিও কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। সেবাকেন্দ্রিক কার্যক্রম পরিচালনা ও জবাবদিহিতার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় এনজিওগুলো নিরাপদে নিশ্চিন্তে তাদের অপতৎরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

'জাগো ফাউন্ডেশন'

রায়ের বাজারে এদের কার্যক্রম পরিচালিত হয় অত্যন্ত সুকৌশলে। এলাকার কোনো নতুন আগন্তুক বা সাধারণ পথিকের পক্ষে বুঝা সম্ভব না। রায়ের বাজারের মাঠের সাথে মূল রাস্তার পাশেই একটি সাদা দো'তলা ভবন রয়েছে। দোতলা ভবনটি অনেকটা চারকোনা ধাঁচের। ভবনের মধ্যখানে রয়েছে উঠানের মতো বিশাল জায়গা। এখানে বাচ্চাদের জন্য রয়েছে খেলাধুলার নানা সামগ্রী।

জাগো ফাউন্ডেশনের রায়ের বাজার শাখাতেই প্রায় ৭০০ ছাত্র বিনামূল্যে পড়াশোনা করছে। ইংলিশ মিডিয়ামভিত্তিক পড়াশোনা হওয়ায় অভিভাবকগণ তাদের সন্তানকে এখানে ভর্তি করাতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। সারাদেশে এদের ১৫টি শাখা আছে। ছাত্র রয়েছে ৩৫০০ এর কাছাকাছি। রায়ের বাজার শাখাতে ৭০০ ছাত্রকে দৈনিক বিনামূল্যে টিফিন দেয়া হয়। প্রতি সপ্তাহে সবাইকে আধা লিটার করে দুধ, মৌসুমী ফল-মূল, ডিটারজেন্ট পাউডার, দামী চকোলেট এবং বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী দেয়া হয়।

বার্ষিক বাজেট এবং ব্যয়খাত

এই এনজিওর বার্ষিক আয় প্রায় ৫০ কোটি টাকা। এর থেকে ব্যয় হয় প্রায় ২০ কোটি টাকা। অবশিষ্ট টাকা খরচ করার জন্য উপযুক্ত মাধ্যম হিসেবে দেশের মেধাবী যুবসমাজকে এরা বেছে নিয়েছে। এরা 'ন্যাশনাল ইয়ুথ এসেম্বলী' শিরোনামে প্রতি বছর দেশের উদীয়মান মেধাবী তরুণদের নিয়ে দিনব্যাপি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। দেশ-বিদেশের প্রসিদ্ধ এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালকবৃন্দ এখানে বক্তব্য রাখেন এবং অনুষ্ঠানের শেষ দিকে তরুণদের থেকে তাদের বর্তমান কার্যক্রম ও লক্ষ্যের কথা শোনা হয়। যাদের চিন্তা বা স্বপ্নের কথা আকর্ষণীয় ও যুগোপযোগী মনে হয় তাদের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা এ এনজিও থেকে করা হয়। ফলে বর্তমানে সমগ্র বাংলাদেশের অধিকাংশ মেধাবী তরুণরা এখন তাদের নেটওয়ার্কের আওতায় রয়েছে। আশঙ্কা হচ্ছে– অদূর ভবিষ্যতে এই এনজিও ব্রাকের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার সক্ষমতা অর্জন করবে।

কাজের ধরণ এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

জাগো ফাউন্ডেশন সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। দেশের অধিকাংশ এলিট শ্রেণীর ছেলে-মেয়েরা এ সংগঠনের সদস্য। বর্তমানে সারাদেশে এ এনজিওর ভলান্টিয়ার সংখ্যা প্রায় ৩২০০। এদের অধিকাংশই ধনী পরিবারের। ফলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এরা বেশ আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকে।

সেভ দ্য চিলড্রেন

এটি ইন্টারন্যাশনাল পর্যায়ের একটি এনজিও। সেভ দ্য চিলড্রেনের কার্যক্রম ও কাজের পদ্ধতি নিয়ে কমবেশি আমরা সবাই জানি। সুবিধাবঞ্চিত অবহেলিত শিশুদের শিক্ষা ও চিকিৎসা নিয়ে এরা মূলত কাজ করে থাকে। কিন্তু বর্তমানে এরা কর্মকৌশলে আরো ব্যাপকতা এনেছে। এর দু'টি উদাহরণ পেশ করছি–

০১. সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে জোনভিত্তিক গরীব শিশুদের একত্র করে প্রজেক্টরের মাধ্যমে মিনা কার্টুন, সিসিমপুরসহ বিভিন্ন কার্টুন প্রদর্শন করা হয়। প্রদর্শন শেষে একজন টিচার দাঁড়িয়ে প্রদর্শিত কার্টুন থেকে কী কী শিখা যায় তা বাচ্চাদের আলাদাভাবে বুঝিয়ে দেয়। ফলে শিশুরা শৈশব থেকে এসব কার্টুন দেখার মাধ্যমে সেক্যুলার ধ্যান-ধারণা নিয়ে বেড়ে উঠছে।

০২. রায়ের বাজার শাখাতে বিভিন্ন উপলক্ষে তাদের যেসব অনুষ্ঠান হয়ে থাকে এ অনুষ্ঠানগুলোতে তারা এমন তরুণ আলেমদের দাওয়াত দিয়ে থাকে, যারা বাতিল ফিরকা বা খ্রিস্টান এনজিও মিশনারী অপতৎপরতা সম্পর্কে সজাগ নন। আলেমদের উপস্থিতি তাদের জন্য ক্লিন-সার্টিফিকেট হয়ে যায় এবং খুব সহজেই এলাকাবাসীর আস্থা অর্জন করতে পারে।

আরবান প্রজেক্ট

রাস্তায় হাঁটার সময় পথিকের বাইরে থেকে মনে হবে এটি একটি বিশাল বস্তি, ভেতরে বস্তিবাসীরা তাদের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন। একজন সাধারণ পথিকের এমনটাই মনে হবে; কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করলে যা দেখা যাবে তাতে যে কেউই হতভম্ব হয়ে যাবেন। বস্তির ঠিক মধ্যখানে একটি পুরনো দোতলা বিল্ডিং; এখানে আরবান প্রজেক্টের বিশাল স্কুল। বস্তির সকল শিশু এখানে বিনামূল্যে পড়াশোনা করে। এরা বাচ্চাদের লাল ড্রেস প্রদান করে থাকে। এই লাল ড্রেসের মানে হলো ফ্রিডম। অর্থাৎ প্রত্যেক শিশুই স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠার অধিকার রাখে। কথাটি আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ মনে হলেও এর আড়ালে লুকিয়ে আছে ধর্মহীন স্বাধীনতার সবক; যা তারা নানা কৌশলে শিশুদের কচিমনে বদ্ধমূল করে দেয়।

মোবাইল বাস-পাইলট প্রকল্প।
এটি একটি এনজিও পরিচালনা করে থাকে। এর স্লোগান হলো, 'স্কুল যাবে তাদের কাছে'। বাইরে থেকে এ বাসটিকে একটি সাধারণ বাসের মতোই মনে হবে। কিন্তু ভিতরটি একটি সুন্দর পরিপাটি স্কুলরুমের মতোই। টিচারের জন্য আছে চেয়ার-টেবিল। পিছনে আছে হোয়াইট বোর্ড। টিচারের সম্মুখে ছাত্রদের বসার জন্য আছে প্রায় ২০টি চেয়ার-টেবিল। সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে সময়মতো মিরপুর, রায়ের বাজার ও হাজারীবাগে বাসটি ৪৫ মিনিট অবস্থান করে। বাসটি এলাকার বাচ্চাদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। কিন্তু মোবাইল বাস পরিচালনায় অনেক অর্থ অবশ্যই খরচ হয়ে থাকে। এতো অর্থ কোথা থেকে আসে তা প্রশ্ন জাগাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর বাসের ড্রাইভার ও টিচার কেউই জানেন না।

হাজারীবাগ বস্তি
হাজারীবাগের এক মাদরাসার সামনেই রয়েছে একটা বস্তি। গত দুই বছর আগেও সেখানে কোনো ধরনের নাচ-গান কিংবা বৈশাখ ও ফাল্গুনের কোনো অনুষ্ঠান দেখা যায়নি। এ বস্তিতে প্রায় একশত পরিবারের বসবাস। এ বস্তিতে তিনটি এনজিও কাজ করে। মূল দায়িত্বে আছে 'আগামীর বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন'। সাথে আছে 'টিচ ফর বাংলাদেশ' ও 'জাগো ফাউন্ডেশন'। টিচ ফর বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক এনজিও। এখানে ছাত্র সংখ্যা ৮০ এর কাছাকাছি।

সপ্তাহের দিন ভাগ করে এ বস্তির বাচ্চাদের নাচ, গান ও ড্রয়িং শিখানো হয়। আমরা যখন শুরুতে এ বাচ্চাগুলোকে কুরআন পড়াতে যাই, প্রবল বাধার সম্মুখীন হই। স্থানীয়দের সহায়তায় সেখানে পড়াতে শুরু করি। এ সময়ে একদম কাছে থেকে এনজিও কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ হয়েছে। তাদের কার্যক্রম অত্যন্ত পরিকল্পিত ও সুচারুরূপে পরিচালনা হয়ে থাকে। পাঠকদের উদ্দেশ্যে এ বস্তিতে স্বচক্ষে দেখা এনজিও কার্যক্রমের কিছু বর্ণনা দেয়া হলো–

০১. নারী অধিকার
প্রতি সপ্তাহে অন্যান্য এনজিও থেকে একজন টিচার আসেন। তিনি ১২ বছর থেকে ১৭/১৮ বছর বয়সী মেয়েদের একসাথে নিয়ে বসেন। তারপর একজন নারীর কী কী অধিকার, ক্যারিয়ারে প্রতিবন্ধকতা আসলে একজন নারীকে কীভাবে মোকাবেলা করতে হবে এর বিস্তারিত কলা-কৌশল শেখান। নারীর ক্যারিয়ারের উন্নতির ক্ষেত্রে মা-বাবা বাধা হলে, স্বামী বাধা হলে, সংসার বাধা হলে, এমনকি সন্তান পালন করতে গিয়ে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে কীভাবে এর মোকাবেলা করতে হবে এর কলা-কৌশল সবিস্তারে শেখানো হয়।

০২. শিশুদের নিয়ে তাদের কাজের ধরণ আলাদা।
শিশুদের সাথে কীভাবে খুব সহজে মিশে যেতে হয় এর জন্য এনজিওর মাঠপর্যায়ের কর্মীগণ বিশেষ প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন। ফলে বাচ্চাদের সাথে খুব দ্রুতই তারা মিশে যেতে পারে।

০৩. কিশোরী ও তরুণীদের নিয়েও আছে আলাদা পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা।
কিশোরী ও তরুণীদের নিয়েও আছে এদের আলাদা চিন্তা। বিশেষভাবে বয়ঃসন্ধির পূর্বে-পরে নির্দিষ্ট মহিলা টিচারের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতে হয়।

০৪. যতো উপলক্ষ ততো আনন্দ
সাপ্তাহিক (যেমন, নারী কাউন্সিল বা কারো জন্মদিন উদযাপন), মাসিক (যেমন, পেরেন্টস্ কাউন্সিল), ও বার্ষিক কার্যক্রম (যেমন, দুই ঈদ, বৈশাখ-ফাল্গুন, ইংরেজি নববর্ষ, কনসার্ট আয়োজনসহ) উপলক্ষে বিভিন্ন পোগ্রাম পরিকল্পনা মাফিক পরিচালিত হয়। আর প্রতিটি অনুষ্ঠানে বস্তির বাচ্চারাই নাচ-গান-নাটকের পারফমেন্স করে থাকে।

০৫. অর্থনৈতিক কার্যক্রম
কয়েক বছর পূর্বেও বস্তির কিছু ঘরে এনজিওদের সুদী লেনদেন ছিলো। এখন তা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। তিন, পাঁচ ও আট হাজার টাকা করে সুদী ঋণ দেয়া হয়। যাদের ঋণের প্রয়োজন নেই তাদেরকেও ঋণ দেয়া হয়। অর্থব্যয় ও খরচের ক্ষেত্রে তারাই দিকনির্দেশনা দেয়; ঋণগ্রহীতা গ্রহণকৃত অর্থ স্বাধীনভাবে খরচ করতে পারে না।

০৬. বিদেশী ডোনার আকর্ষণ
দেশী ও বিদেশী ডোনার আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে তারা বেশ সচেতন; কারণ এ ডোনেট দিয়েই তারা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। একজন ডোনারের বিদেশ থেকে শুরু করে স্পটে আসা পর্যন্ত তারাই সমস্ত সহযোগিতা অব্যাহত রাখে। একজন ডোনারের যাতায়াত, খাদ্যব্যবস্থা ও নামকরা হোটেলে থাকার সকল ব্যয়ও এনজিও নিজে বহন করে।

০৭. স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্যসচেতনতা
স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্যসচেতনার মাঝে পার্থক্য আছে। স্বাস্থ্যসেবা মানে চিকিৎসাসেবা দেয়া আর স্বাস্থ্যসচেতনতা মানে রোগ সম্পর্কে সচেতন করা। খাবারের পূর্বে, ইস্তেঞ্জা শেষে পানি দিয়ে হাত ধৌত করার ব্যাপরে সতর্ক করা। এ দু'টি ক্ষেত্রেই এনজিওগুলো বেশ কার্যকর ভূমিকা রাখছে। স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ বেশি হয়ে থাকে। কিন্তু স্বাস্থ্যসচেতনতার ক্ষেত্রে তেমন ব্যয় নেই। ফলে তারা অধিকহারে এ আয়োজনটি করে থাকে।

০৮. প্রজেক্টর কার্যক্রম
সবচেয়ে সহজ ও সবচেয়ে কার্যকর কার্যক্রম হলো প্রজেক্টরে কার্টুন-সিনেমা প্রদর্শন। বিভিন্ন সময়ে বাচ্চাদেরকে প্রজেক্টরের সাহায্যে নানা অনুষ্ঠান প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। মিনা কার্টুন, সিসিমপুরসহ বিনোদনমূলক প্রোগ্রাম দেখানো হয়। বাচ্চারা এ অনুষ্ঠানের শিক্ষাগুলো খুব সহজে গ্রহণ করে নিতে পারে।

০৯. সামাজিক সচেতনতা
সামাজিক সচেতনতা তৈরির ক্ষেত্রে পেরেন্টস্ কাউন্সিলকে এনজিওগুলো বেশ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এ ছাড়া গর্ভকালীন সময়, বাচ্চা পালনের ক্ষেত্রেও গুরুত্ব সহকারে (ওদের ভাষায়) সামাজিক সচেতনতা তৈরী করে।

১০. এবং প্রত্যেক কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা, সাবলীলতা ও আন্তরিকতার পরিচয় দেয়া।

এদের প্রায় সকল কার্যক্রমে প্রত্যেক কর্মী দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে থাকে। যে দায়িত্ব পালনে যতো সচেষ্ট হবে তার সেলারি ও পদোন্নতি ততো দ্রুত হবে।

প্রিয় পাঠক! আমাদের বাড়ির পাশে কিংবা এলাকায় এমন অনেক এনজিও গোপনে কাজ করে যাচ্ছে। বাহ্যিক আচরণে এদের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ না থাকলেও অভিজ্ঞ ও চিন্তাশীল যে কেউ সহজেই তাদের সুদূরপ্রসারী চক্রান্তের আঁচ করতে পেতে পারেন। তাদের বিরুদ্ধে এখনই কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে এর ফলাফল নিশ্চিতরূপে ভয়ংকর হবে। তাই সকল পাঠকের নিকট বিনীত নিবেদন, নিজে সচেতন হই এবং এ অন্যদেরকে সচেতন করি।

এনজিও মোকাবেলায় আমাদের কিছু অবশ্য-করণীয় আছে। সেগুলো না করে শুধু মৌখিক সচেতনতার মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। ইনশাআল্লাহ আগামীপর্বে অভিজ্ঞতালব্ধ কিছু করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করবো।

বাবরী মসজিদ : ইতিহাসের এক নির্মম ট্রাজেডি

মাওলানা কিফায়াতুল্লাহ রওশন

মুসলিম স্থাপত্যশৈলীর এক অপূর্ব নিদর্শন ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ। এটি কেবল একটি মসজিদেরই নাম নয়; বাবরী মসজিদ একটি চেতনার নাম।

মোঘল সম্রাট জহীরুদ্দীন মুহাম্মদ বাবরের সেনাপতি মীর বাকী ৯২৫ হিজরী মোতাবেক ১৫৩৮ ঈসায়ীতে সম্রাটের স্মৃতিরক্ষায় অযোধ্যার একখণ্ড পতিত জমিতে এই মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি প্রিয় সম্রাট বাবরের নামেই মসজিদটির নামকরণ করেন বাবরী মসজিদ।

বাবরী মসজিদ, না রাম মন্দির?

আমরা জেনেছি বাবরী মসজিদ নির্মিত হয় মোঘল সম্রাট বাবরের শাসনামলে। সেই থেকে মুসলমানরা মসজিদটিতে নামায আদায় করছেন নির্বিঘ্নে। এভাবেই কেটে গেছে বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ। এ সময় কেউ এসে দাবী করেনি– এই মসজিদের জায়গা আমাদের এবং এই আপত্তিও কোনদিন তোলা হয়নি– আপনাদের মসজিদ অবৈধ স্থানে নির্মিত। এভাবেই ১৮ শতাব্দী পর্যন্ত কোন বিতর্ক ছাড়াই মুসলমানরা অবাধে যাতায়াত করেছেন মসজিদে। হঠাৎ একসময় হিন্দুদের পক্ষ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দাবী ওঠে– অযোধ্যা নাকি তাদের দেবতা রামের জন্মভূমি। এখানে নাকি তাদের রাম মন্দির ছিলো। সম্রাট বাবর তাদের মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ নির্মাণ করেছেন। এ সকল দাবী তুলে চরম বিশৃঙ্খলা শুরু করে কিছু হিন্দু উগ্রবাদী। এসময় যে দাবীগুলো তুলে তারা তাদের কার্যসিদ্ধির পথে অগ্রসর হয় সেগুলো হলো–

১. অযোধ্যায় নির্মিত বাবরী মসজিদের স্থানটি তাদের দেবতা রামের জন্মভূমি।

২. মোঘল সম্রাট বাবর রাম মন্দির ধ্বংস করে বাবরী মসজিদ নির্মাণ করেছেন।

৩. মুসলমানরা বিজয়ী বেশে এসে মন্দির ধ্বংস করেছে।

তাদের এ সকল দাবীর পক্ষে মজবুত কোন দলীল নেই। না তখন ছিলো, না এখন আছে। তবে এ দাবীগুলোর পেছনে কিছু কারণ কাজ করছিলো, যা তাদের ইন্ধন যুগিয়েছিলো এই হীনকর্মে। ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমরা এ বিতর্কের মৌলিক তিনটি কারণ চিহ্নিত করতে পারি। তা হলো–

এক. কবি বাল্মীকি রচিত কাব্যগ্রন্থ রামায়ণ। এ গ্রন্থে তিনি অযোধ্যাকে রামের জন্মভূমি বলে উল্লেখ করেছে এবং মসজিদের স্থানটিকেই এর জন্য বিশেষভাবে শনাক্ত করেছে। হিন্দুরা সেটাকেই ওহীর মত গ্রহণ করেছে।

অথচ ভারতের সর্বজনমান্য ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণের প্রায় সর্বসম্মত মত হলো, আদতে রাম নামের কোন রাজপুরুষের বা দেবতার অস্তিত্ব কোনোকালে ছিলো কি না তাতে সন্দেহ আছে। সত্যি সত্যি রাম নামের কোন রাজা কোনোকালে কোথাও থেকে থাকলেও তার রাজধানী যে অযোধ্যা তার সাথে বর্তমান অযোধ্যার না আছে কোন ভৌগলিক মিল, না আছে কোনরূপ পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ। কেননা কিছুদিন আগে নেপালও দাবী করেছে– রামের জন্মভূমি ভারতের অযোধ্যায় নয়; বরং নেপালেরই একটা এলাকায়। সে এলাকার নামও অযোধ্যা।

দুই. ইংরেজরা তাদের অবস্থান মজবুত ও নিষ্কণ্টক করার জন্য সব সময় চাইত মুসলমান ও হিন্দুদের মাঝে দ্বন্দ্ব বাঁধিয়ে রাখতে। এই হীন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় তারা মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ করা হয়েছে এ মর্মে রিপোর্ট পেশ করে পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে করেছে। এসব রিপোর্ট বিতর্কের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। কেননা তারা রাজ্য দখল করেছিলো মুসলমানদের কাছ থেকে। এক্ষেত্রে হিন্দুদের সমর্থন ও সহযোগিতা তাদের প্রয়োজন ছিলো। তারা হিন্দুদের উত্তেজিত করার জন্য প্রচার করতে থাকে, অযোধ্যার অধিকাংশ মসজিদ হিন্দুদের মন্দির ভেঙ্গে কিংবা তাদের কোন পবিত্র স্থানে নির্মিত।

অন্যদিকে এই ইংরেজরাই তাদের গেজেটিয়ার ও প্রত্নতাত্ত্বিক রিপোর্টসমূহে ঐসব পবিত্র স্থান সম্পর্কে উদ্দেশ্যমূলকভাবে তথ্য প্রচার করতে থাকে যে, এগুলো বিরান হয়ে বন-জঙ্গলে পরিণত হয়েছিলো। এ জাতীয় বক্তব্যের দ্বারা উদ্দেশ্য ছিলো মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করা তারা যেন হিন্দুদের দাবী মেনে না নেয়।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব দমনের পরেই মূলত চতুর ইংরেজ বেনিয়া গোষ্ঠী ভারতে নির্বিঘ্নে তাদের শাসন শোষণ চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের পরীক্ষিত অস্ত্র Divide and rule policy অর্থাৎ ভাগ করো ও শাসন করো নীতিতে জঘন্য খেলায় মেতে ওঠে।

এই লক্ষ্যে ফয়জাবাদের তৎকালীন জেলা প্রশাসক এইচ.এর নেভিল প্রথম ফয়জাবাদ ডিস্টিক্ট গেজেটের ১৭৩ পৃষ্ঠায় লেখেন, ১৫২৮ সালে বাবর অযোধ্যায় আসেন এবং এক সপ্তাহ অবস্থান করে প্রাচীন মন্দির ধ্বংস করে ঐ স্থানে এক মসজিদ নির্মাণ করেন যা বাবরী মসজিদ নামে খ্যাত। এই ইংরেজ তার এই কথার সমর্থনে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ দেয়নি।

বাবরী মসজিদ যখন নির্মাণ করা হয়, সে সময়টা ছিলো রাম চরিত্র মানস কাব্যের রচয়িতা তুলসি দাসের সময়। এই তুলসি দাসই রাম কথাকে উপজীব্য করে হিন্দু ভাষায় জনপ্রিয় করে তোলে। আর সেই সাথে রামের জন্মস্থান হিসেবে অযোধ্যার মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে, যা পরে লোক বিশ্বাসে রূপ নেয়। চতুর ইংরেজরা এই সুযোগ লুফে নেয়। তখন অযোধ্যার মুসলিম শাসক নবাব ওয়াজেদ আলী শাহকে গদিচ্যুত করার হীন উদ্দেশ্যে রাম মন্দির ভাঙ্গার কাল্পনিক কাহিনী প্রচারে ইন্ধন যোগাতে থাকে। এই ষড়যন্ত্রের হোতা ছিলো বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধি কর্নেল উইলিয়াম। তার কাজ ছিলো মুসলিম রাজশক্তির বিরুদ্ধে হিন্দু প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তোলা।

এখন যেখানে সীতার রসুই ঘর বা রাম চবুতরা, কর্নেল শ্রীমান সেখানে রামের পূজা চালু করে। ১৮৫৫ সালে কর্নেল শ্রীমান ও তার উত্তরসূরী অডিটামের উস্কানিতে হিন্দুরা মসজিদ দখলের দাবীতে দাঙ্গা শুরু করে। এতে প্রায় ৭৫ জন নিহত হয়। নওয়াব ওয়াজেদ আলী সেই দাঙ্গা কৌশলে দমন করেন। এক সময় সুযোগসন্ধানী ইংরেজরা অযোধ্যায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির অজুহাতে অযোধ্যা দখল করে নেয়।

তিন. কট্টরপন্থী হিন্দুদের সবসময় কামনা ছিলো মুসলমানদের উচ্ছেদ করে নির্ভেজাল হিন্দুরাষ্ট্র গঠন করা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সবচেয়ে বেশি উগ্র মনোভাব দেখাচ্ছে আর.এস.এস. বা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ। বর্তমান ক্ষমতাসীন বিজেপির মূল সংগঠন এটি। বা বলা যায় আর.এস.এস. বিজেপির আদর্শিক অভিভাবক। ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত

এ সংগঠনটি জনসংঘ নামে রাজনৈতিক প্লাটফর্ম নিয়ে কাজ করছিলো। ১৯৭৭ সালে জনসংঘ মানে আর.এস.এস. জনতা বা বিজেপিতে মিশে যায়। এই আর.এস.এস. কতটা উগ্র সাম্প্রদায়িকতা পোষণ করে তার একটা দৃষ্টান্ত দিলেই কিছুটা বুঝে আসবে। মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী নাথুরাম গডসে ছিলো একজন আর.এস.এস. সদস্য। হত্যার কারণ সম্পর্কে আদালতের জবানবন্দিতে সে বলেছিলো, মহাত্মা গান্ধী মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের অনুমোদন দিয়ে মুসলমানরা যে আমাদের উপর একহাজার বছর অত্যাচার করে গেছে তার প্রতিশোধ নেয়ার রাস্তা রুদ্ধ করে দিয়েছে। আর.এস.এস. এর এ কট্টোর ও উগ্রবাদী মনোভাবের কারণে ইংরেজ আমলে এদেরকে নিষিদ্ধ করা হয় এবং ইংরেজ পরবর্তীকালে করা হয় কালো তালিকাভুক্ত। তবে এ সংগঠন এক সময় নিষিদ্ধ বা কালো তালিকাভুক্ত থাকলেও এখন তারা বেশ সক্রিয় এবং চাঙ্গা। কারণ এর পৃষ্ঠপোষকতায় আছে এখন রাষ্ট্রের প্রধান তিন কর্তাবাবুই এবং ক্ষমতাসীন আরও অনেকে। বাবরী মসজিদ শহীদ করার ক্ষেত্রে আর.এস.এস. এর ভূমিকা ছিলো অগ্রণী। মানুষের মাঝে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপণ করে মুসলিমদের প্রতি আক্রমণাত্মক মনোভাব তৈরি করে হিন্দু ধর্মের সারবত্তা ও ইসলাম ধর্মের অসারতা প্রচার করে একটা গণজাগরণ তৈরি করা ছিলো তাদের মূল লক্ষ্য। আর এই গণজাগরণের পরীক্ষামূলক প্রতিফলন ছিলো বাবরী মসজিদ ধ্বংস করিয়ে নেয়া। কারণ বাবরী মসজিদ শহীদকারীদের মূলহোতা বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদভানী, মুরলি মনোহর জোশী ও উমা ভারতীসহ ৪৯ জন ছিলো তখন আর.এস.এস. এর আদর্শিক নেতা। এই সংগঠনের সাথে আদর্শিকভাবে যুক্ত ছিলো বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরঙ্গ দল।

এ সংগঠনগুলোর আদর্শিক নেতাদের উগ্রমনোভাব বুঝার জন্য আরেকটা উদাহরণ দেয়ার প্রয়োজন মনে করছি–

১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তৃতীয় সম্মেলন। উক্ত সম্মেলনে জম্মুর ধর্মগুরু জগপূর্ণদাস তার বক্তব্যে বলেন, অযোধ্যায় মন্দির নির্মাণের স্বার্থ শুধু হিন্দুদের নয়; এর সাথে গোটা জাতির সম্মান জড়িত। আমরা যখন বৃটিশ আক্রমণের সব চিহ্ন মুছে ফেলতে পেরেছি তখন বাবরের চিহ্ন মুছে ফেলতে পারবো না কেন?

আদালতে মামলা এবং মামলার রায়

মসজিদ চত্ত্বর নিয়ে হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব শুরু হয় সেই ১৮৫৩ সাল থেকে। সিপাহী বিপ্লবের দুই বছর পর প্রথম পর্দা টানিয়ে আলাদা করা হয় মুসলমানদের নামাযের জায়গা এবং হিন্দুদের প্রার্থনাস্থল। এরপর ১৮৮৫ সালে রাম চতুরায় পূজাপাঠ ও মন্দির গড়তে চেয়ে আদালতে মামলা করেন রঘুবর দাস। আদালত সে আবেদনে সাড়া দেয়নি। পরের বছর পুনরায় চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় সে। এরপর দীর্ঘদিন কেটে গেলেও বিরোধটি বড় আকার ধারণ করেনি।

মূল ঘটনা শুরু হয় ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরে। কিছু হিন্দু উগ্রবাদী রাতের আঁধারে তালা ভেঙে মসজিদের ভেতর রামের মূর্তি স্থাপন করে এবং আদালতে স্থানটিতে তাদের উপাসনার জন্য খুলে দেয়ার দাবী করে। ঐ সময় ক্ষমতায় ছিলো কংগ্রেস। তারা চাইলে সেই শক্তিগুলোকে প্রতিহত করে মূর্তি অপসারণ করে বাবরী মসজিদের আসল রূপ বহাল রাখতে পারতো। কেননা যে রাতে মসজিদে মূর্তি রাখা হয়েছিলো, সে রাতে ইশার নামায জামা'আতের সাথে আদায় করা হয়েছিলো। অর্থাৎ মসজিদ হিসেবে তা পুরোদস্তুর সচল ছিলো; বিরান ছিলো না। কিন্তু কংগ্রেস মূর্তি অপসারণের পরিবর্তে তালা লাগিয়ে দেয়। আর বিষয়টিকে ফয়েজাবাদ কোর্টে দাখিল করিয়ে দেয়। তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলো জওহরলাল নেহরু।

এরপর দীর্ঘদিন তালা ঝুলে থাকায় সবাই একপ্রকার ভুলেই গিয়েছিলো বাবরী মসজিদের কথা। কিন্তু বিস্মৃতপ্রায় বিতর্কটিতে পুনরায় জাগিয়ে তোলে রাজিব গান্ধী। শাহবানু মামলায় মুসলিমদের তোষামোদ করায় কংগ্রেসের উপর হিন্দুরা রুষ্ট হয়। ফলে ১৯৮৬ সালে লালকৃষ্ণ আদভানীর নেতৃত্বে বিতর্কিত স্থানে রাম মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হলে উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়। সে সময় বাবরী মসজিদ ভেঙে রাম মন্দির স্থাপনের আন্দোলন জোরদার করে সে। এরপর তারই নেতৃত্বে ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর মসজিদের নাম নিশানা ওখান থেকে মিটিয়ে দেয়।

বাবরী মসজিদ অ্যাকশন কমিটি আদালতে মালিকানা অধিকারের মামলায় লড়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু সবশেষে হলো কি? ২০১৯ সালের নভেম্বরে মোদী সরকার তাদের ক্ষমতা ও পদের সম্পূর্ণ ফায়দা নিয়ে বাবরী মসজিদের মালিকানা অধিকারের জন্য এমন রায় করিয়ে নিয়েছে যে সুপ্রিমকোর্টের পাঁচ বিচারক (চিফ জাস্টিসসহ) ওকালতির জীবনেও ভাবতে পারেনি যে, তাদের এমনও রায় শোনাতে হবে। বাবরী মসজিদের সম্পূর্ণ জায়গা রাম মন্দির ট্রাস্টকে দিয়ে দেয়া হয়েছে। আর বাবরী মসজিদ অ্যাকশন কমিটিকে দেয়া হয়েছে অন্য স্থানে মসজিদ করার জন্য মাত্র ৫ একর জমি। যেন জুতা মেরে অন্নদান। আদালতের এ রায়টা যেন এমন হলো– হিন্দুদেরকে বলা হলো, তোমরা ঘোলের স্বাদ দুধে মেটাও আর মুসলিমদের বলা হলো তোমরা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাও।

হাস্যকর ও পক্ষপাতিত্বে ভরপুর এ রায়ে পুরা বিশ্ব অবাক চোখে দেখলো, বাবরী মসজিদ অ্যাকশন কমিটির সব প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও এবং আদালত কর্তৃক তার স্বীকৃতি দেয়ার পরও আদালতকে এ কথা বলতে হয়েছে– এই ভূমির উপর হিন্দু সম্প্রদায়ের 'বিশ্বাস' জড়িত এজন্য সম্পূর্ণ ভূমি তাদের দিয়ে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত প্রমাণাদিকে পদপিষ্ট করে হিন্দুদের 'বিশ্বাস'-এর স্বীকৃতি দেয়া হলো এবং সম্পূর্ণ ভূমি রাম জন্মভূমি ট্রাস্টকে অর্পণ করা হলো।

রায়ের প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম নেতৃবৃন্দ নিজ-নিজ অবস্থান থেকে প্রতিবাদমূলক মন্তব্য করেছেন এবং এ রায় যে উদ্দেশ্যপূর্ণ ও ন্যায়বিচার বিরোধী তা-ও স্পষ্ট করেছেন।

হায়দারাবাদের এমপি ও মুসলিম সমাজের প্রথম সারির নেতা আসাদুদ্দীন ওয়াইসি এই রায় সম্পর্কে বলেছেন, 'সুপ্রীমকোর্ট ইজ সুপ্রীম, বাট নট ইনফ্যালিবল। অর্থাৎ সুপ্রীমকোর্ট মাননীয় বটে, অভ্রান্ত নয়। সুতরাং বাবরী ছিলো, আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদ হিসেবেই বহাল থাকবে। এই রায়ের ফলে এমনকি এখানে মন্দির নির্মাণ করা হলেও এর মসজিদ-পরিচয় কোনদিন বিলুপ্ত হবে না।'

মসজিদ শহীদ করার মামলা

এরপর থাকলো মসজিদ শহীদ করার মামলা। মসজিদের শাহাদতের পর কংগ্রেস বিচারপতি লিবারহান কমিশন গঠন করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপর বিচারপতি লিবারহান কমিশন তদন্তের পর বাবরী মসজিদের জন্য দোষী হিসেবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নাম উল্লেখ করেছিলেন। বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদভানী, মুরলি মনোহর জোশী, উমাভারতীসহ ৪৯ ব্যক্তিকে তিনি অভিযুক্ত করেছিলেন। এরা সকলেই বিজেপি বা আর.এস.এস., বিশ্ব হিন্দু

পরিষদ ও বজরঙ্গ দলের আদর্শিক নেতা ও স্বয়ংক্রিয় সদস্য। সিবিআই-ও বিশেষ তদন্তের মাধ্যমে তাদের সবাইকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছিলো। আর তাদের সবার বিরুদ্ধে প্রমাণ এতোটাই মজবুত ছিলো যে, অবশ্যই তাদের সাজা হওয়ার কথা। তারা নিজেরাও একথা বলতো যে, আমাদের যে শাস্তি হবে আমরা তা মেনে নেবো। কারণ, তারা জানতো যে, তাদের অপরাধ এতোটাই স্পষ্ট যে, এখান থেকে শাস্তি বিনে ছাড়া পাওয়া অসম্ভব।

কিন্তু এখানেও আর.এস.এস.-এর মতাদর্শ কাজ করেছে। জাস্টিস এস.কে. যাদব সেই রায়ই পড়ে শুনিয়েছে যা প্রকাশ্যে আসার আগেই ভেবে-চিন্তে তৈরি করে রাখা হয়েছিলো। অপরাধীদের ১৭জন মারা যাওয়ার পর ৩২জনের ব্যাপারে আদালত রায় শোনাতে গিয়ে বলেছেন, এরা সবাই বাবরী মসজিদ ধ্বংসকারী শত্রুগোষ্ঠীকে বাধা দিচ্ছিলো। মসজিদ ধ্বংসের ঘটনায় তাদের কোন ভূমিকা ছিলো না। এজন্য সবাইকে সসম্মানে নির্দোষ ঘোষণা করা হচ্ছে।

এটা ভারতের বিবিআই-এর বিশেষ আদালতের রায়। অর্থাৎ দিনের আলোতে ন্যায়বিচার রক্তে রঞ্জিত হলো। আর সারাবিশ্ব দেখলো উদ্দেশ্যমূলকভাবে এক ধর্মের লোকদের প্রশ্রয় দিয়ে অন্য ধর্মের লোকদের ক্ষতবিক্ষত করে ধর্মনিরপেক্ষ-তার দাবীদার ভারত রাষ্ট্রের পূর্ণ পক্ষপাতমূলক ইনসাফ বিহীন রায়।

প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ রায় মেনে নিতে হচ্ছে মুসলমানদের। নতুবা আদালত অবমাননার অপরাধে অভিযুক্ত হতে হবে।

তা সত্ত্বেও রায় ঘোষণার পর আসাদুদ্দীন ওয়াইসি প্রশ্ন করেছেন, 'সারা দুনিয়া দেখেছে, বাবরী মসজিদ ভাঙার দিনে সেখানে মঞ্চের ওপর বসে আদভানী-যোশীরা মিষ্টি বিলি করছিলেন। তাহলে তারা কীভাবে নির্দোষ হতে পারেন? ডিসেম্বরের ৬ তারিখে মসজিদটি কি জাদুবলে ধ্বংস হয়েছিল? কে করসেবকদেরকে জমায়েত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল? মসজিদের ভেতরে মূর্তিও কি জাদুবলেই চলে এসেছিল? আর এই অভিযুক্তদের যদি সে দিনের ঘটনায় কোনও ভূমিকাই না থাকে তাহলে মসজিদ ভাঙল কারা?

দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম মুফতী আবুল কাসেম নোমানী বলেছেন, 'বাবরী মসজিদের রায় ঘোষণার সময় দেশের উচ্চ আদালত মেনে নিয়েছে যে, ১৯৯২ সালে বাবরী মসজিদ ধ্বংস করা ছিল অবৈধ, তারপরও অপরাধীদেরকে খালাস কিভাবে দেয়া হলো এটা আমাদের বোধগম্য নয়। এই রায় আমাদেরকে হতাশ করেছে। এ ধরনের রায় বিশ্ব-দরবারে আদালতের ভাব-মর্যাদা কলঙ্কিত করবে।'

বাবরী মসজিদ অ্যাকশন কমিটির নেতা জাফর জিলানী বলেছেন, 'যেখানে মাত্র দুজন সাক্ষীর ভিত্তিতে খুনের আসামীকেও সাজা দেয়া যায় সেখানে কয়েক ডজন সাক্ষী থাকার পরও আদালত কীভাবে বলতে পারে কোনও প্রমাণ নেই? তাছাড়া এই সাক্ষীদের মধ্যে পুলিশ বা কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর শীর্ষকর্তারাও ছিলেন যারা মুসলমান নন। এছাড়াও ছিলো অসংখ্য মিডিয়া রিপোর্ট ও ফোটোগ্রাফারদের ছবি।'

শেষকথা

ক্ষমতাসীন দাম্ভিকেরা জুলুম করার সময় একবারের জন্যও পরিণতি ভেবে দেখে না। দিন বদলে যেতে পারে, ঘটনা উল্টে যেতে পারে– এটা তাদের কল্পনায়ও থাকে না। সুতরাং মুসলমানদেরকে ধৈর্য ধরে সেই দিনটির প্রতীক্ষায় থাকতে হবে, যে দিনটি ৮৬ বছর পর নসীব হয়েছে ইস্তাম্বুলের আয়া সোফিয়ার। পাশাপাশি বাবরীর ইমারত হাতছাড়া হলেও মুসলমানদের অন্তর্জগতে নির্মাণ করে রাখতে হবে বাবরীর জন্য একটুকরো সবুজ যমীন। যেমনটি বলেছেন মুহতারাম আসাদুদ্দীন ওয়াইসি– 'ওরা বলে, তোমরা আর কতোদিন বাবরীর কাহিনী শোনাতে থাকবে?! আমি আগেও বলেছি, আজও বলছি– অন্যরা কী করবে, না-করবে জানি না, তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং আমার দলের পক্ষ থেকে বলছি– যখন আমি এই পৃথিবী থেকে চলে যাবো, সন্তানদের শিখিয়ে যাবো, উপদেশ দিয়ে যাবো এবং মৃত্যুর সময় ওসিয়ত করে যাবো যে, প্রিয় বেটা! প্রিয় বেটী! আমার মতো তোমরাও তোমাদের সন্তানদেরকে এই উপদেশ ও ওসিয়ত প্রদান করে যাবে যে, ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর উগ্র সংঘপরিবার বাবরী মসজিদকে শহীদ করে দিয়েছে। শোনো সংঘপরিবার! যতোদিন এই পৃথিবী বাকি থাকবে, আমরা হিন্দুস্তানে বাবরী মসজিদের শাহাদাতের আলোচনা করতেই থাকবো এবং বিশ্বসমাজকে জানাতেই থাকবো যে, তোমরা সুপ্রীমকোর্টের নিকট অঙ্গীকার করেছিলে যে, বাবরী মসজিদের একটি ইটেও হাত লাগাবে না। সেই তোমরা এবং তোমাদের লোকজন বাবরী মসজিদকে শহীদ করে দিয়েছো এবং সেই মসজিদ যেখানে সাড়ে পাঁচশত বছর ধরে আমরা হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ-এর গুঞ্জরণ জারি রেখেছিলাম, তোমরা তাকে শহীদ করে দিয়েছো এবং ডাকাতির স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ বাবরীর ইট পর্যন্ত খুলে নিয়ে গিয়েছো। আমরা আমাদের সন্তানদেরকে বলে যাবো– যতোক্ষণ তোমাদের হুঁশজ্ঞান বাকি থাকে কালিমাও পড়তে থাকবে সেইসাথে বাবরী মসজিদের শহীদ হওয়ার কথাও উচ্চারণ করতে থাকবে!

লেখকপরিচিতি: শিক্ষার্থী, ইফতা ১ম বর্ষ, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

(২ পৃষ্ঠার পর; সম্পাদকীয়)

এ বিধানের প্রতি লক্ষ্য রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও প্রশাসনের মূল দায়িত্বশীলদের নিকট আমাদের প্রত্যাশা– তারা ভাস্কর্যের নামে প্রাণীর মূর্তি স্থাপনের এ অপ্রয়োজনীয় ও অহেতুক অপকৌশলকে আর একটুও এগোতে দেবেন না। বরং দেশের যেখানেই ভাস্কর্যের নামে মূর্তি স্থাপিত আছে সেগুলোকেও সুযোগমত অপসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অতীতের মুসলিম শাসকগণ এ দায়িত্ব পালনে যথার্থ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে আলেমগণের দায়িত্ব হলো, এ জাতীয় পাপকাজে হুমকি-ধমকির পথে না গিয়ে হেকমত ও হিতাকাঙ্ক্ষার আকারে শাসকবর্গ ও দেশবাসীর সামনে এ মর্মে কুরআন-সুন্নাহর বিধান তুলে ধরতে ত্রুটি না করা। এ ক্ষেত্রে আলেমগণের দায়িত্ব এতোটুকুই; ভাঙচুর ও শক্তিপ্রয়োগ করা তাদের দায়িত্ব নয়। আর মুসলিম জনসাধারণের কাজ হলো এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আলেমগণের মতামতকে মনেপ্রাণে শ্রদ্ধা করা। অন্যায়কে অন্যায় মনে করে মন থেকে ঘৃণা করা ও প্রত্যাখ্যান করা এবং সাধ্যসীমায় থেকে পাপকাজকে নিরুৎসাহিত করা। দলীয় বা ব্যক্তিগত স্বার্থে কিংবা নির্দিষ্ট কোন আলেমের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে শরীয়তের অকাট্য বিষয়াবলীকে প্রত্যাখ্যান করে অন্যায়কে সমর্থন করলে কিংবা নিরুদ্বেগ থাকলে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় পার পেয়ে গেলেও পরকালে পার পাওয়ার আশা করার কোনও সুযোগ নেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সীরাতে মুস্তাকীমের পথে পরিচালিত করুন। আ-মীন।

তালিবে ইলমের উদ্দেশে অমূল্য উপদেশমালা-১

সংকলক : মাওলানা জাহিদুল ইসলাম ফরিদপুরী

যখন নিয়মতান্ত্রিক তালিবে ইলম ছিলাম তখন থেকেই আসাতিযায়ে কিরামের বিভিন্ন নসীহত ডায়েরিতে টুকে রাখার অভ্যাস ছিলো। আলহামদুলিল্লাহ, এ অভ্যাস এখনও বহাল আছে। মনি-মুক্তা তুল্য সে উপদেশমালার নির্বাচিত অংশ তালিবে ইলমদের খেদমতে পেশ করা হল। উল্লেখ্য, নসীহতগুলোর কোনটিই আমার নয়, সবগুলোই আমার মাথার তাজ আসাতিযায়ে কিরামের যবান থেকে শোনা। আল্লাহ তা'আলা আমাকেসহ সকল তালিবে ইলমকে এগুলোর উপর আমল করার তাওফীক দিন। আ-মীন।

০১. আমাদের আর তোমাদের মাঝে পার্থক্য এতটুকু যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দুনিয়াতে আগে প্রেরণ করেছেন আর তোমরা পরে এসেছো। বয়সে বড় হওয়ার কারণে আমরা মাদরাসার নিয়মতান্ত্রিক কোর্স তোমাদের আগে সম্পন্ন করেছি। কোন জিনিস আগে অর্জন করা আল্লাহ তা'আলার নিকট শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয়। তোমরা পরে এসেও আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসার পাত্র হতে পারো, আর আমরা আগে এসেও আল্লাহ তা'আলার ক্রোধে নিপতিত হতে পারি; যদি না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে হিফাজত করেন।

০২. আমরা নবী কিংবা ফেরেশতা নই। সুতরাং আমাদেরও ভুল হতে পারে। আমাদের ভুল হলে আমরা বড় বলে তোমাদের জন্য সে ভুলের অনুসরণ করা উচিৎ হবে না। তবে অনুসরণ না করাটা যেন বেয়াদবী আকারে প্রকাশ না পায়। তাহলে কী করতে হবে? চিন্তা করবে যে, এ ভুলটি তোমাদের কারও দ্বারা সংঘটিত হলে তোমাদের যারা ছোট তাদের থেকে কিরূপ আচরণ আশা করতে– তোমরাও তোমাদের বড়দের ভুলের ক্ষেত্রে অনুরূপ আচরণ করবে।

০৩. দুঃসাধ্যকে সাধন করার প্রবল ইচ্ছা থাকলে কোন কাজই কঠিন মনে হবে না। কেউ অথৈ পানিতে নামতে প্রস্তুত থাকলে হাঁটু পানিতে নামতে ভয় পাবে না। আর হাঁটু পানি দেখেই যার কলিজা কাঁপে, অথৈ পানিতে নামা তার জন্য কেবল কঠিনই হবে না; একেবারে অসাধ্য মনে হবে।

০৪. একটা বদ অভ্যাস হল, আমরা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে অন্যের জিনিস অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করি। অথচ উচিৎ ছিল, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া অন্যের জিনিস ব্যবহারই না করা। একান্ত প্রয়োজন দেখা দিলে সেক্ষেত্রেও অনুমতি নিয়ে ব্যবহার করা।

০৫. আমাদের আরেকটা ক্রুটি হল, আমরা অপরিচিতদেরকে মূল্যায়ন করি না। অথচ পরিচিত-অপরিচিত সকলকেই সম্মান করা উচিৎ। হতে পারে, যাকে আমি তুচ্ছ মনে করছি, তিনি আমার চেয়ে ইলমে-আমলে অনেক বড়। অনেক সময় আকার আকৃতিতে ছোট কোন আলেমকে, যাকে দেখতে ছাত্রের মত মনে হয়, মূল্যায়ন করি না। আবার দেখা যায়, নিজের উস্তাদ নন বিধায় কোন বড় আলেমকেও যথাযথ শ্রদ্ধা করি না। আবার ছোটবেলায় যাদের কাছে পড়েছি তাদেরকে সম্মান করি না। এ জাতীয় মনোভাব ও ক্রুটি অবশ্যই সংশোধন হওয়া উচিৎ এবং এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই পরিবর্তন করা উচিৎ।

০৬. ইলমে দীন অর্জনের ক্ষেত্রে উস্তাদের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং কাজে-কর্মে, চলনে-বলনে, আচরণ ও উচ্চারণে কোনভাবে উস্তাদের মনে কষ্ট লাগলে ইলম অর্জন অবশ্যই বাধাগ্রস্ত হবে; অন্তত অর্জিত ইলমের বরকত নষ্ট হয়ে যাবে।

০৭. উস্তাদদের শাসনকে গনীমত মনে করা উচিৎ। মনে রেখো, এক সময় তুমিও উস্তাদ হবে, তখন তোমার ভুল-ক্রুটির ক্ষেত্রে তোমাকে শাসন করার কেউ থাকবে না।

০৮. বর্তমানে কিছু কিছু ছাত্রের অবস্থা হচ্ছে ইয়াহুদীদের মতো। ইয়াহুদীরা হযরত জিবরীল আলাইহিস সালামকে শত্রু মনে করতো। কারণ, তিনি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে কোন কোন সময় শাস্তির বিধানও নিয়ে আসতেন। তদ্রূপ একশ্রেণীর ছাত্রের অবস্থা হল, যে উস্তাদ মাদরাসার আইন-কানূন যথাযথ প্রয়োগ করতে চান তারা তাকে শত্রু মনে করে।

০৯. কিছু ছাত্রের অবস্থা হল, যে উস্তাদ শাসন করতে চান তারা তাকে শোষণকারী মনে করে, তাঁকে উপেক্ষা করে চলে। তাদের হাবভাব দেখে মনে হয়, উস্তাদ না-জানি বিরাট কোন অন্যায় করে বসেছেন।

১০. মাদরাসার ইজতিমায়ী সামান অর্থাৎ গণ-আসবাবপত্র নিজের সামান-পত্রের মত ব্যবহার করা উচিৎ। এর ব্যাখ্যা হল, আমরা নিজের মাল-সামান যেভাবে সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার ও হিফাজত করি ইজতিমায়ী সামানাও সেভাবে হিফাজত করা উচিৎ। তবে যেহেতু ইজতিমায়ী সামানায় সকলের হক বিদ্যমান, সেহেতু একান্ত ব্যক্তিগত কাজে ইজতিমায়ী আসবাবের ব্যবহার পরিহার করা উচিৎ। মোটকথা, ইজতিমায়ী সামান ব্যবহারের ক্ষেত্রে মনে করা যে, এখানে সকলের হক রয়েছে আর হিফাজতের ক্ষেত্রে এটাকে নিজের সামান মনে করা কর্তব্য।

১১. উস্তাদ দরসে উপস্থিত থাকা অবস্থায় তাঁর অনুমতি ছাড়া দরস থেকে উঠে যাওয়ার ফলে উস্তাদকে অবহেলা ও তুচ্ছ করা হয়। উঠে যাওয়া ছাত্রটি হয়তো উস্তাদকে অবহেলা ও তুচ্ছ করার ইচ্ছা করে না, কিন্তু তার কাজ দ্বারা এমনটিই বোঝা যায়। লক্ষ্য করো, আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে কি বলেছেন–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَي أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُون بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

অর্থ: 'নিশ্চয় প্রকৃত মুমিন তারাই যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখে। আর যখন তারা আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে সমষ্টিগত (ইজতিমায়ী) কোন কাজে লিপ্ত থাকে তখন তারা রাসূলের অনুমতি ব্যতিত চলে যায় না।' (সূরা নূর-৬২)

১২. নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তোলো, সাথী-সঙ্গীর অভাব হবে না। আর অযোগ্য থেকে গেলে খুঁজেও সাথী-সঙ্গী পাবে না।

১৩. কোন ছাত্রকে তার অন্যায় সত্ত্বেও উস্তাদ যদি কিছু না বলেন, বা না বলতে পারেন, কিংবা বলতে সংকোচবোধ করেন তাহলে ছাত্রের জন্য এটা শুভকর নয়। ছাত্রের অবস্থা তো এমন হওয়া

উচিত যে, যে কোন উস্তাদ যে কোন সময় যে কোন কথা নির্দ্বিধায় তাকে বলতে পারেন, শাসন করতে পারেন, ধমক দিতে পারেন।

১৪. ছাত্রের মনে করা উচিৎ যে, আমার উস্তাদগণ আমার পিতৃতুল্য। জন্মদাতা না হলেও তাঁরা আমার রূহানী পিতা এবং আমি তাঁদের রূহানী সন্তান। সুতরাং শরীয়তের পক্ষ হতে জন্মদাতা পিতার জন্য যে সকল হক নির্ধারণ করা হয়েছে, রূহানী পিতা উস্তাদদের ক্ষেত্রেও সে হকগুলো আদায় করতে সচেষ্ট থাকা উচিৎ।

মাতা-পিতার জীবদ্দশায় ৭টি হক রয়েছে। যথা: ১. সম্মান। ২. ভালোবাসা। ৩. আনুগত্য। ৪. সেবা। ৫. প্রয়োজন পূরণ। ৬. আরামের ফিকির। ৭. মাঝে-মাঝে সশরীরে সাক্ষাৎ।

মাতা-পিতার ইন্তেকালের পরও ৭টি হক রয়েছে। যথা: ১. মাগফিরাতের দু'আ করা। ২. নেককাজের মাধ্যমে সাওয়াব পৌঁছানো। ৩. নিকটাত্মীয় ও বন্ধুদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। ৪. নিকটাত্মীয় ও বন্ধুদের অর্থিক সহযোগিতা। ৫. ঋণ ও আমানত আদায়। ৬. বৈধ অসিয়ত পূরণ। ৭. মাঝে-মধ্যে কবর যিয়ারত।

১৫. উস্তাদের নির্দেশ পালন আর তার খিদমত করার মধ্যে পার্থক্য এই– নির্দেশ পালন হল, উস্তাদ নিজের প্রয়োজনে ছাত্রকে কোন কাজের কথা বললে তা পালন করা। আর খিদমত হল, ছাত্রের নিজ আগ্রহে উস্তাদের কোন কাজ করে দেয়া।

১৬. তালিবে ইলমের এ বিষয়টি লক্ষ্য রাখা উচিৎ যে, কোন উস্তাদকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে অন্য উস্তাদ যেন মনে কষ্ট না পান বা অসন্তুষ্ট না হোন।

১৭. তালিবে ইলমের জন্য উস্তাদের সঙ্গে তর্ক করা বা উস্তাদকে যুক্তি দেয়া অহংকারের আলামত।

১৮. উস্তাদের দু'আ পাওয়ার অন্যতম উপায় হল উস্তাদের মানশা ও মনোচাহিদা বুঝে চলা। এটি উস্তাদের নিকট ছাত্রের সবচেয়ে পসন্দের গুণ। উদাহরণত:

ক. উস্তাদ পান চিবোচ্ছেন, পিকদানটি এগিয়ে দেয়া।

খ. উস্তাদ উযূ করছেন, গামছাটি এনে দেয়া।

গ. দেখে মনে হচ্ছে উস্তাদ বাইরে যাবেন, জুতোজোড়া সোজা করে দেয়া।

ঘ. উস্তাদ মুতালা'আকালীন এদিক সেদিক তাকিয়ে কিছু একটা খুঁজছেন, বুঝতে হবে কোন অভিধান বা কিতাব খুঁজছেন। ব্যস, বুঝতে পারলে অভিধান বা কিতাবটি এগিয়ে দেয়া কিংবা উস্তাদকে জিজ্ঞেস করে তিনি কি খুঁজছেন জেনে নেয়া।

ঙ. উস্তাদ ঘুমানোর পূর্বে ইস্তিঞ্জায় গিয়েছেন, এই সুযোগে উস্তাদের বিছানার চাদরটা ঝেড়ে পরিপাটি করে রাখা।

চ. উস্তাদ কখন ঔষধ খান, কখন পানি পান করেন এগুলোর সময় খেয়াল করে সময়ের পূর্বেই পানির গ্লাস, ঔষধ ইত্যাদি ব্যবস্থা করে রাখা। এছাড়া ছাত্রের জন্য উস্তাদের পানি পান করা ইত্যাদি কাজের সময়সূচী জেনে রাখা কর্তব্য যাতে সহজে ব্যবস্থা করে রাখা যায়।

১৯. উস্তাদ কর্তৃক কোন ছাত্রকে কাজের জন্য ডাকা ছাত্রের প্রতি উস্তাদের সুধারণার লক্ষণ। কাজেই এটাকে মুসীবত মনে না করে গনীমত মনে করা উচিৎ।

২০. উস্তাদ কোন কাজের কথা বললে আগে তা ভালোভাবে বুঝে নেয়া, এরপর কাজটি আঞ্জাম দেয়া। কাজ না বুঝেই করতে লেগে গেলে লজ্জিত হতে হয়। উদাহরণত:

ক. উস্তাদের মেহমান এসেছেন। মেহমানদারীর জন্য ভালো তরকারীর ব্যবস্থা করা দরকার। তিনি কোন ছাত্রকে টাকা দিয়ে বললেন, গরুর গোশত নিয়ে এসো। ছাত্রটি খুব সতর্কতার সঙ্গে ভালো দেখে এক কেজি কাঁচা গরুর গোশত নিয়ে আসল!

খ. উস্তাদ তার কোন ছাত্রের নিকট গিয়েছেন। ছাত্র জিজ্ঞেস করল, হুযুর কী খাবেন? উস্তাদ বললেন, 'জিরা পানি'। ছাত্রটি 'জিরা পানি'র মর্ম না বুঝে নিয়ে এসেছে আস্ত জিরা আর খিলি পান।

২১. অন্যায় করার পর অন্যায়ের অনুভূতি না থাকাটাও একধরনের অপরাধ।

২২. মেধাবী মুআদ্দাব ছাত্র তার ইলম থেকে যতোটুকু ইস্তিফাদা করতে পারবে মেধাবী বে-আদব ততোটা পারবে না। আর মেধাবী বে-আদব ছাত্র থেকে মেধাহীন মুআদ্দাব ছাত্র অনেক উত্তম।

২৩. কয়েকজন উস্তাদ একসঙ্গে বসে আছেন। এ অবস্থায় কোন একজন পানি পান করতে চাইলে তাঁকে পান করিয়ে অন্য উস্তাদদেরকেও জিজ্ঞেস করা যে, তাঁদেরও পানি পান করার প্রয়োজন আছে কিনা।

২৪. উস্তাদ বা বড় কোন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে শুধু উস্তাদ বা বড় ব্যক্তির সঙ্গে মুসাফাহা করে ক্ষান্ত না থাকা; তাঁর আশ-পাশের অন্য লোকদের সঙ্গেও মুসাফাহা করা। তবে যে মজলিসে অনেক লোকের সমাগম থাকে সেখানে সবার সঙ্গে মুসাফাহা না করে আশ-পাশের দুয়েকজনের সঙ্গে মুসাফাহা করা।

২৫. নিজের চেয়ে বড় ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোন মজলিস আহ্বান করা হলে নিজ দায়িত্বে বড় ব্যক্তির উপস্থিত হওয়ার আগেই যথাস্থানে উপস্থিত হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করা। কারো পক্ষ থেকে ডাকাডাকির অপেক্ষা না করা।

২৬. নিজের বুঝ উস্তাদদেরকে বোঝানোর চেষ্টা না করে বরং উস্তাদদের বুঝ নিজে বোঝার চেষ্টা করা উচিৎ।

২৭. উস্তাদগণ বা বড় কেউ কোন কাজের দায়িত্ব দিলে তার স্থান-কাল-পাত্র অনুধাবন করে ভালোভাবে আঞ্জাম দেয়া।

২৮. ছাত্রের জন্য উস্তাদের হাতে কুমারের মাটির মত হওয়া উচিৎ। কুমার যেমন কাঁচা মাটি দ্বারা যেমন খুশি হরেক রকম পাত্র তৈরি করেন উস্তাদও ছাত্রের যোগ্যতা বিবেচনা করে ছাত্রকে গড়ে তুলবেন ও কাজে লাগাবেন।

২৯. মাদরাসা নির্বাচনের ক্ষেত্রে শুধু কারুকার্য ও সুযোগ-সুবিধা না দেখে মাদরাসার তা'লীম-তরবিয়তের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মাদরাসার দায়িত্বশীল উস্তাদগণের চিন্তা- চেতনা ও মন-মানসিকতার প্রতি খেয়াল করা যেতে পারে।

৩০. তলবে ইলমীর যামানায় উস্তাদ বা বড় কারো ধমক সহ্য করার মনোভাব রাখলে পরবর্তীকালে তুমিও কাউকে ধমক দেয়ার অধিকার রাখবে, নচেৎ নয়।

৩১. ছাত্রের জন্য উস্তাদ বা বড় কোন ব্যক্তির ধমকের ভয়ে কিংবা লজ্জায় ন্যায়সঙ্গত ও জরুরী কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত নয়; এতে বহুবিধ যোগ্যতা অর্জন থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়।

৩২. প্রত্যেক ছাত্রের জন্য তা'লীমী মুরুব্বী ও ইসলাহী মুরুব্বী নির্ধারণ করা অবশ্যই জরুরী। তা'লীমী মুরুব্বী ও ইসলাহী মুরুব্বী একজনও হতে পারেন, ভিন্ন ভিন্নও হতে পারেন।

৩৩. তা'লীমী মুরুব্বী বা ইসলাহী মুরুব্বী এমন কাউকে নির্বাচন করা উচিৎ, যার মশওয়ারা আমি নির্দ্বিধায় মানতে পারব।

৩৪. নিয়তের বিশুদ্ধতা ও তা'লীমী মুরুব্বীর কথা মানার দৃঢ় ইচ্ছা থাকলে কোন ছাত্র পরামর্শ করতে ভয় পাওয়ার কথা নয়। যাদের উল্লিখিত দু'টি বিষয়ের কোন একটির ত্রুটি থাকে তারাই কেবল তা'লীমী মুরুব্বী থেকে পরামর্শ নিতে ভয় পায়।

৩৫. কী পড়ব? কিভাবে পড়ব? কোথায় পড়ব? একজন ছাত্রের জন্য এসব চিন্তা

না করে তা'লীমী মুরুব্বীর পরামর্শ অনুযায়ী পড়া- লেখায় মনোযোগী হওয়া উচিৎ।

৩৬. কোন উস্তাদের কার্যাবলী আমার পসন্দনীয় না হলে সুন্দরভাবে পরিহার করা। বেয়াদবী যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা খুবই জরুরী।

৩৭. কোন ছাত্রের জন্য 'আমি পারি না, পারব না' জাতীয় বাক্যের ব্যবহার অনুচিৎ। এর পরিবর্তে 'চেষ্টা করে দেখি, চেষ্টা করব, বলে দিলে বা শিখিয়ে দিলে পারব ইনশাআল্লাহ'– এ জাতীয় বাক্য ব্যবহার করা উচিৎ।

৩৮. আমার থেকে বয়সে বা মর্তবায় বড় কারো সঙ্গে কথা বলার ক্ষেত্রে আদেশ ও নিষেধ-সূচক বাক্য ব্যবহার অনুচিৎ। উদাহরণতঃ দু'আ চাই, দু'আর দরখাস্ত, ছুটির প্রয়োজন ছিল– এ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করা উচিৎ। পক্ষান্তরে দু'আ করবেন, বাড়ি যাব, ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি– এ জাতীয় বাক্য পরিহার করা উচিৎ।

৩৯. কোন ব্যাপারে বড়দের তাশাদ্দুদ ও কঠিনতা নিজে বড় হওয়ার পর বুঝে আসে। নিজে বড় হওয়ার আগে বড়দের তাশাদ্দুদ বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে। এজন্য বুঝে না আসলেও ছবর করা উচিৎ।

৪০. উস্তাদ কোন কিছু ক্রয় করতে বললে হিসাব দিয়ে টাকা নিয়ে নেয়া উচিৎ। কেউ মনে করতে পারে, উস্তাদের কাছ থেকে এই সামান্য টাকা আর কি নেবো! অথচ উস্তাদ এটা নিয়ে বড় পেরেশানীতে থাকেন যে, কে যেন সাবান এনে দিলো? কে যেন পাঞ্জাবীটা ইস্ত্রী করে দিলো? তাকে তো টাকাটা দেয় হয়নি!

৪১. তুমি যদি সায়্যিদ (নেতা) হতে চাও তাহলে অবশ্যই তোমাকে খাদিম (সেবক) হতে হবে। খাদিম না হয়ে সায়্যিদ হলে তোমার সায়্যিদিয়াত (নেতাগিরি) বেশিদিন টিকবে না।

৪২. ফারাগাতের আগে বা পরে কখনো কোন উস্তাদের নিকট গেলে তার অনুমতি ব্যতিত অন্যত্র না যাওয়া উচিৎ। এতে উস্তাদের পেরেশান হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

৪৩. উস্তাদগণ পিতৃতুল্য। সুতরাং জন্মদাতা পিতার মতো তাদেরও নিজ রূহানী সন্তানকে মহব্বত ও শাসন উভয়টির অধিকার রয়েছে।

৪৪. উস্তাদ-ছাত্রের সম্পর্ক নিছক প্রাতিষ্ঠানিক নয়; বরং এ সম্পর্ক চিরকালের। সুতরাং ফারাগাতের পরও উস্তাদ প্রদত্ত শিক্ষা ও দীক্ষা উভয়টি আন্তরিকভাবে জীবনে ধারণ করা উচিৎ। ফারাগাতের পর উস্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসলে লেবাস-পোশাকে ছাত্র যামানার মূল ধাঁচ বজায় রাখা চাই।

৪৫. কেউ বড় হলেই সব সময় তার মাথায় সবকিছু আসবে এটা জরুরী নয়। এজন্য ছোটদের মাথায় ভালো কোন চিন্তা-ভাবনা আসলে বড়দেরকে বলা দরকার। এই ভেবে বিরত না থাকা যে, আমি তো ছোট মানুষ, আমার কথা কি আর গ্রহণযোগ্য হবে!

৪৮. জীবনের সর্বক্ষেত্রে উন্নতির পথে বড় বাধা হল- অলসতা, লজ্জা, হীনম্মন্যতা ও ভীতি। সুতরাং সর্বদা এগুলো পরিহার করার চেষ্টা করা উচিৎ।

৪৭. কারো সঙ্গে কথা বলার সময় তার মেযাজ ও মানসিকতা অনুপাতে কথা বলা উচিৎ। অন্যথায় অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের সম্মুখীন হওয়ার আশংকা রয়েছে।

৪৮. টয়লেট থেকে বের হওয়ার সময় أترك المكان أفضل مما كان নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিৎ। অর্থাৎ কোন স্থান তোমার ব্যবহারের আগে যতোটুকু ভালো ছিলো, তা চেয়ে ভালো অবস্থায় পরিত্যাগ করো। এ নীতি টয়লেটসহ সকল স্থানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

৪৯. জীবনে সফল হওয়ার জন্য লেখা-পড়াটাই সবকিছু নয়। লেখা-পড়ার পাশা-পাশি শেখা-শেখিরও দরকার আছে। কথাটা এভাবেও বলা যায়, কেতাবী শিক্ষার সঙ্গে দীক্ষা না থাকলে নিছক কেতাবী শিক্ষা দ্বারা সাফল্য অর্জন করা যায় না। শিক্ষা অর্জিত হয় উস্তাদের মাধ্যমে কিতাব থেকে, আর দীক্ষা অর্জিত হয় উস্তাদের সোহবত বা সান্নিধ্য থেকে।

৫০. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করলেই ভালো ছাত্র হওয়া যায় না। ভালো ছাত্র হতে হলে আরো কিছু গুণ অর্জন করতে হয়। যথা:

ক. কিতাবাদি বুঝতে পারা বা বোঝার যোগ্যতা অর্জনে সচেষ্ট হওয়া।

খ. হাতের লেখা সুন্দর হওয়া বা সুন্দর করার চেষ্টা করা।

গ. বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে পারা বা চেষ্টা করা।

ঘ. আখলাক-চরিত্র সুন্দর হওয়া বা সুন্দর করার চেষ্টা করা।

৫১. ভালো হওয়ার প্রথম ধাপ হল, 'আমি ভাল হতে চাই' নিজের ভেতর এই প্রেরণা জাগ্রত করা। আর কোন কিছু শেখার প্রথম ধাপ হল, 'আমি পারি না, পারতে চাই' নিজের ভেতর এই আগ্রহ সৃষ্টি করা।

৫২. অভিভাবকের খরচে জীবন চালনাকালীন কোন জিনিস সংগ্রহ ও বর্জন করার ক্ষেত্রে 'জরুরত'-এর প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিৎ; নিজস্ব রুচি-অভিরুচির প্রতি নয়। জরুরত তো কোনরকমে পুরা হলেই হয়। কিন্তু রুচি-অভিরুচি পূরণের জন্য শুধু জরুরত নয়, অজুহাতেরও প্রভাব থাকে।

৫৩. উস্তাদ বা বড় ব্যক্তি কোন কিছু জিজ্ঞেস করলে উত্তর না দিয়ে চুপ থাকার দ্বারা সম্মান প্রদর্শন হয় না; বরং অনেক ক্ষেত্রে এটা তাদের মনোকষ্টের কারণ হয়। প্রশ্ন বুঝে থাকলে অবশ্যই উত্তর দেয়া উচিৎ। আর না বুঝে থাকলে আদবের সঙ্গে বলা যেতে পারে, হুযুর! বুঝতে পারিনি। আর উত্তর দেয়া মুনাসিব না হলে 'ক্ষমা চাই' বলা যেতে পারে।

৫৪. প্রতিটি জিনিসের ব্যাপারে তিনটি বিষয় লক্ষ্য রাখা উচিত–

ক. লক্ষ্য-উদ্দেশ্য।

খ. ব্যবহার পদ্ধতি বা লক্ষ্যে পৌছার উপায়।

গ. লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জিত হচ্ছে কিনা। উদাহরণত দুনিয়ায় আমরা কেন এসেছি, কোন পদ্ধতিতে জীবন যাপন করছি এবং আমাদের আগমনের লক্ষ্য অর্জনে আমরা কতটুকু সফল। এভাবে প্রতিটি ব্যাপারেই সর্বদা খেয়াল রাখা উচিৎ।

৫৫. উস্তাদের সঙ্গে বাইরে কোথাও গেলে হাঁটার পথ হলে উস্তাদের সঙ্গে বা আগে হাঁটা, যাতে উস্তাদের পথ চলতে কোন রকম বাধার সৃষ্টি না হয়।

৫৬. উস্তাদের সঙ্গে বাইরে গিয়ে কোথাও বসার প্রয়োজন হলে উস্তাদের কাছাকাছি বসা বা থাকা, যেন উস্তাদ প্রয়োজনে সহযোগিতা নিতে পারেন। তাছাড়া উস্তাদের পাশে কোন ধূমপায়ী বা এ জাতীয় লোক বসার চেয়ে একজন ছাত্রই অধিক উপযুক্ত।

৫৭. তুমি যতো বড়ই জ্ঞানী হও না কেন কারো তত্ত্বাবধান গ্রহণ না করলে তোমার ইলম তোমার জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে এবং তোমার ইলম দুনিয়ার কাজে ব্যবহৃত হতে পারে।

৫৮. তোমার আচরণ ও উচ্চারণে কেউ কষ্ট পেয়ে থাকলে তোমার মনযিলে মকসূদে পৌঁছা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সুতরাং সর্বদা সাবধান থাকা উচিৎ।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য, ইনশাআল্লাহ।)

সংকলক পরিচিতিঃ আমীনুত তা'লীম, মা'হাদু উলূমিল কুরআন, বাইতুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর-১৩, ঢাকা।

ফাতাওয়া-মাসাইল

ফাতাওয়া বিভাগ : জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) সাতমসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোনে মাসআলা জানতে : ০১৯১৪৬২৭৬১৩ (বাদ আসর থেকে রাত ১০টা)

মাওলানা এম. হাসান
ফরিদপুর

৩৯০ প্রশ্ন : আমরা জানি, উযূ ও পবিত্রতা ছাড়া কুরআনে কারীম স্পর্শ করা যায় না। এ বিষয়ে কুরআনের স্পষ্ট দলীল হলো, সূরা ওয়াকিয়ার আয়াত لا يمسه الا المطهرون কিন্তু সম্প্রতি আমাদের এলাকার এক মাহফিলে জনৈক আলেম দাবী করেন যে, 'এই আয়াতে পবিত্র কুরআন বলতে লওহে মাহফূযের কুরআন বোঝানো হয়েছে। সুতরাং দুনিয়ার কুরআন জানাবাত অবস্থায় স্পর্শ না করা গেলেও উযূ ছাড়া স্পর্শ করা যাবে।' এখন জানার বিষয় হলো, উল্লিখিত আলেমের কথা কতটুকু সঠিক এবং উল্লিখিত আয়াতে কুরআন বলে লওহে মাহফূযের কুরআন বোঝানো হয়েছে– এ মর্মে আদৌ কোন বর্ণনা আছে কি না? থাকলে সেই বর্ণনার গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু এবং তা আমলযোগ্য কি না? যদি আমলযোগ্য না হয়ে থাকে তাহলে এমন কথা বর্ণনাকারী আলেমের বয়ান শোনার বিধান কী?

উত্তর : সূরা ওয়াকিয়ার আয়াত لا يمسه الا المطهرون এর মধ্যে مطهرون (পবিত্রগণ) দ্বারা কারা উদ্দেশ্য এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও মুফাস্‌সিরদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। তাদের একটি বড় জামা'আতের নিকট مطهرون দ্বারা উদ্দেশ্য ফেরেশতা, যারা পাপ পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. হযরত আনাস রাযি., মুজাহিদ রহ., ইকরামা রহ. ও সাঈদ ইবনে জুবাইর রহ. থেকে এই তাফসীরই বর্ণিত। ইমাম মালেক রহ.-ও এই তাফসীর গ্রহণ করেছেন।

আর কিছু মুফাস্‌সিরীনে কেরামের নিকট এর পূর্বের আয়াতের قرآن শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ মুসহাফ যা আমাদের হাতে আছে, আর مطهرون দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সমস্ত লোক যারা যাহেরী-বাতেনী অপবিত্রতা অর্থাৎ ছোট ও বড় নাপাকী থেকে পবিত্র। ছোট নাপাকী দ্বারা উদ্দেশ্য উযূ না থাকা; যা থেকে উযূ করার মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জিত হয়। বড় নাপাকী দ্বারা উদ্দেশ্য জানাবাত, হায়েয ও নেফাস; যেগুলো থেকে গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জিত হয়। হযরত সালমান ফারেসী রাযি. আয়াতের এ অর্থই বুঝেছেন। হযরত আতা রহ., তাউস রহ. সালেম রহ. এবং মুহাম্মাদ বাকের রহ. থেকে এই তাফসীরই বর্ণিত। আল্লামা কুরতুবী রহ. এই তাফসীরকে সুস্পষ্ট বলেছেন। তাফসীরে মাযহারীতে এই তাফসীরকে প্রধান্য দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় তাফসীর অনুযায়ী আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, আমাদের কাছে বিদ্যমান কুরআন শরীফ পবিত্রতা ছাড়া স্পর্শ করা জায়েয নেই। আর পবিত্রতা দ্বারা উদ্দেশ্য বাহ্যিক অপবিত্রতা থেকে হাত পবিত্র হতে হবে, উযূ থাকতে হবে এবং জানাবাত থেকেও পবিত্র থাকতে হবে।

সুতরাং আয়াতের তাফসীরের ক্ষেত্রে দু'টি তাফসীরই বর্ণিত আছে।

তবে আয়াতের তাফসীর যেটাই হোক, শুধুমাত্র দাঊদ যাহেরী রহ. ছাড়া সবাই এ কথার উপর ঐকমত্য পোষণ করেন যে, পবিত্রতা ছাড়া কুরআন শরীফ স্পর্শ করা যাবে না। কেননা এ আয়াত ছাড়াও এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুস্পষ্ট সহীহ হাদীস রয়েছে, যেখানে পবিত্রতা ছাড়া কুরআন শরীফ স্পর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছে। হাদীস শরীফে আছে–

عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه واليا إلى اليمن قال: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر.

অর্থ : হযরত হাকীম ইবনে হিযাম থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে ইয়ামানের গভর্নর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন তখন তাকে বলেন, পবিত্রতা ছাড়া কুরআন শরীফ স্পর্শ করবে না। (মুস্তাদরাকে হাকেম; হা.নং ৬০৫১)

এছাড়া হযরত উমর রাযি.-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা দ্বারাও বুঝা যায় যে, উযূ ছাড়া কুরআন শরীফ স্পর্শ করা জায়েয নেই–

عن أنس بن مالك، قال: خرج عمر متقلدا السيف، فقيل له: إن ختنك وأختك قد صبوا، فأتاهما عمر وعندهما رجل من المهاجرين يقال له: خباب، وكانوا يقرؤون طه، فقال: أعطوني الكتاب الذي عندكم أقرأه وكان عمر يقرأ الكتاب، فقالت له أخته: إنك رجس، ولا يمسه إلا المطهرون، فقم فاغتسل أوتوضأ، فقام عمر فتوضأ ثم أخذ الكتاب فقرأ طه.

অর্থ : হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উমর রাযি. একদিন খোলা তরবারী হাতে নিয়ে বের হলেন, তাকে বলা হলো– তোমার ভগ্নিপতি ও তোমার বোন ইসলাম গ্রহণ করেছে, তখন তিনি তাদের কাছে আসলেন। তাদের নিকট একজন মুহাজির সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। নাম খাব্বাব রাযি.। তারা সূরা ত্ব-হা তিলাওয়াত করছিলেন। উমর রাযি. তাদেরকে বললেন, তোমাদের নিকট যে কিতাব (কুরআন শরীফ) আছে তা আমাকে দাও আমি তা পড়ব। উত্তরে তার বোন বললেন, আপনি অপবিত্র; আর এ কিতাব পবিত্রতা ছাড়া স্পর্শ করা যায় না সুতরাং আপনি গোসল অথবা উযূ করে আসুন। উমর রাযি. উযূ করে আসলেন এবং কিতাব নিয়ে পড়া শুরু করলেন। (সুনানে দারাকুতনী; হা.নং ৪৪১)

এছাড়াও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক হযরত আমর ইবনে হাযম রাযি.-এর নিকট অর্পণ করা চিঠিতেও পবিত্রতা ছাড়া কুরআন শরীফ স্পর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

সুতরাং উক্ত আলেম সাহেবের বক্তব্য 'এই আয়াতে পবিত্র কুরআন বলতে লওহে মাহফূযের কুরআন বোঝানো হয়েছে। সুতরাং দুনিয়ার কুরআন জানাবাত অবস্থায় স্পর্শ না করা গেলেও উযূ ছাড়া স্পর্শ করা যাবে।' কথাটি সঠিক নয়। বরং কুরআন শরীফ যেমনিভাবে জানাবাত অবস্থায় স্পর্শ করা যায় না তেমনিভাবে উযূ ছাড়াও স্পর্শ করা নাজায়েয। এটা তার অজ্ঞতা কিংবা হঠকারিতা বৈ কিছু নয়।

এ জাতীয় সর্বসম্মত মাসআলার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর কথা বর্ণনাকারী আলেম থেকে সতর্ক থাকা উচিত। ইচ্ছাকৃতভাবে এমন বিভ্রান্তি প্রচারকারী শরীয়ত মতে ফাসিক হবে। তার ইমামতি মাকরূহে তাহরীমী হবে। (সূরা ওয়াকিয়া- ৭৭-৭৯, সূরা নিসা- ১১৫, মুস্তাদরাকে হাকেম; হা.নং ৩৭৮২, ৬০৫১, সুনানে দারাকুতনী; হা.নং ৪৪১, সুনানে বাইহাকী কুবরা; হা.নং ৪১৩, মুসনাদে ইবনুল জা'আদ;

হা.নং ২৩৬৬, তাফসীরে ইবনে কাসীর ৭/৫৪৪, ৫৪৫, তাফসীরে মাযহারী ৯/১৮১, ফাতাওয়া শামী ১/৮৯, আন-নাওয়াদির ওয়ায-যিয়াদাত আলা মা ফিল-মুদাউওয়ানাতি মিন গাইরিহা মিনাল উম্মাহাত ১/১২৩, আল-বায়ান ফী মাযহাবিল ইমামিশ শাফিঈ ১/৩২০, আল-ইকনা' ফিল-ফিকহিশ শাফিঈ; পৃষ্ঠা ৩৩, আল-মুগনী ১/১০৮, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন ৮/২৮৬)

মুহাম্মাদ আবরার
কসবা, বি-বাড়িয়া

৩৯১ প্রশ্ন : আমার বায়ু নির্গত হওয়ার উযর ছিলো। অর্থাৎ এই পরিমাণ সময় উযূ থাকত না, যে সময়ের মধ্যে ৪ রাকা'আত ফরয নামায আদায় করা যায়। আলহামদু-লিল্লাহ! এখন আমি কিছুটা সুস্থ। তবে অনেক সময় প্রায় আধা ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা উযূ থাকে, আবার অনেক সময় খুব তাড়াতাড়ি অর্থাৎ ৫/১০ মিনিট পরপর উযূ চলে যায়। এমতাবস্থায় আমার জন্য এক ওয়াক্তে একবার উযূ করার দ্বারা পুরা ওয়াক্ত উযূসহ হিসেবে থাকার সুযোগটা থাকবে কী? আর কতটুকু সময় উযূ থাকলে সুস্থ এবং কতটুকু সময় পরপর উযূ চলে গেলে আমি মাযূর বলে গণ্য হব? অনুগ্রহ করে বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত উযরের কারণে যেহেতু আপনি উযূ করে ফরয নামায আদায় পরিমাণ সময় উযরবিহীন অবস্থায় পাননি, কাজেই আপনি মাযূর হিসেবে গণ্য হয়েছে। পরবর্তী সময়ে পূর্ণ এক ওয়াক্ত নামাযের সময় পরিমাণ উযরবিহীন অবস্থায় অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত আপনি মাযূরই থাকবেন। অতএব বর্তমান অবস্থায় আপনার জন্য এক ওয়াক্তে একবার উযূ করার দ্বারা পুরা ওয়াক্ত উযূ অবস্থায় গণ্য করার সুযোগ থাকবে। উক্ত উযূ দ্বারা (উযূ ভঙ্গের অন্য কোনো কারণ না পাওয়া পর্যন্ত) ফরয-নফল সব নামাযই আদায় করা যাবে। (নূরুল ঈযাহ ওয়া নাজাতুল আরওয়াহ ফিল-ফিকহিল হানাফী; পৃষ্ঠা ১০৯, মাজমাউল আনহুর ১/৪৫, ফাতাওয়া শামী ১/৩০৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৮/২৩১)

মুহাম্মাদ জুনাইদ
ঢাকা

৩৯২ প্রশ্ন : (ক) মুআযযিন সাহেবের জন্য কি আযানের পরে মাইকে আযানের দু'আ পড়া জায়েয আছে?

(খ) আযানের আগে বা পরে নামাযের জন্য মাইকে ডাকাডাকি করা, গজল ইত্যাদি গাওয়া জায়েয আছে কি? দলীলসহ জানালে ভালো হয়।

উত্তর : (ক) আযানের পর দু'আ করা একটি মুস্তাহাব আমল। এ দু'আর বিশেষ ফযীলতের কথা হাদীসে এসেছে। তবে এ দু'আ নিয়মিত মসজিদের মাইকে উচ্চস্বরে পাঠ করার পদ্ধতিটি বিদ'আত এবং পরিত্যাজ্য। কেননা যিকির, দু'আ, তাসবীহাত ইত্যাদি ব্যক্তিগত আমলের ক্ষেত্রে আওয়াজ নিচু হওয়া কাম্য। আযানের পর আযানের দু'আ যিকিরেরই অন্তর্ভুক্ত। আর দু'আর ব্যাপারে উচ্চস্বরে ঘোষণা দিয়ে পড়ার নিয়ম বানিয়ে নেয়া শরীয়তস্বীকৃত নয়। (সূরা আ'রাফ-২০৫, সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৮৯, ৬১১৯, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ২৯৬৬৩, ২৯৬৬৪, ফাতাওয়া শামী ২/৫০৭, ৬/৩৯৮, ইমদাদুল আহকাম ১/৩২০, আহসানুল ফাতাওয়া ১/৩৬৯)

(খ) আযান ও ইকামাতের মাঝে নামাযের জন্য মুসল্লীদেরকে পুনরায় حي على الصلاة، حي على الفلاح، قامت الصلاة، الصلاة جامعة، الصلاة الصلاة এ সকল শব্দ দ্বারা মসজিদের দিকে আহ্বান করাকে শরীয়তের পরিভাষায় তাসবীব বলা হয়। এটা একবার জায়েয আছে। কর্মব্যস্ত মানুষের সমাগম কিংবা ঘুমন্ত মানুষের মজমায় গিয়ে ডাকাডাকি হতে পারে।

আর আযানের মাইকে গজল গাওয়া ইত্যাদিতে অকারণে মানুষকে কষ্ট দেয়ার আশঙ্কা আছে। তাই এটা জায়েয নয়। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৯৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১১৩, বাদায়িউস সানায়ে' ১/৩৬৮, ফাতাওয়া শামী ১/৩৮৯, হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ১৯৮, তাবয়ীনুল হাকায়িক ১/২৪৫, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ২/৯০, ফাতাওয়া কাসিমিয়্যা ৫/৫৫৭)

মুহাম্মাদ ইসমাঈল
আরশি নগর, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা

৩৯৩ প্রশ্ন : (ক) তাবলীগ জামা'আতের চলমান সংকটের পূর্ব থেকেই আমি তাবলীগের কাজের সঙ্গে জড়িত। অবশ্য এ বিভক্তির পর কিছুদিন আমি এতায়াতীদের সঙ্গেই ছিলাম। কারণ আমার ধারণা ছিল– হয়তো উভয় দল মিলে যাবে। অথচ তখনও উলামায়ে কেরামের প্রতি আমার অগাধ ভালোবাসা ছিলো। কিন্তু পরবর্তী সময়ে টঙ্গীর ময়দানে আলেমদের প্রতি এতায়াতীদের নৃশংস অত্যাচার দেখে আমি তাদের সঙ্গ ত্যাগ করি। পরিবারের সকলে এবং এলাকার সাথীরা মিলে তাদের সঙ্গে থাকার জন্য অনেক চেষ্টা করলেও এখন আমি উলামায়ে কেরামের সঙ্গে আছি। তবে মহল্লার পাঁচকাজ উভয় গ্রুপ একই সঙ্গে করে থাকে। মশওয়ারায় মাঝেমধ্যে আলেমদের বিরুদ্ধে কথা উঠলে কেউ না থাকলে আমিই জবাব দেই। এর ফলে কখনো আমাকে আমার আব্বার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করতে হয়। ফলে আমার আব্বা আমাকে বেয়াদব মনে করেন এবং আমার উপর কষ্ট পান। পরে আমি আব্বার কাছে মাফও চেয়েছি। কিন্তু তাদের মতাদর্শী না হওয়ায় তিনি আমার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েই থাকেন। আব্বা আমাকে সা'দ সাহেবের অনুসরণ করতে বললে আমি অস্বীকার করায় তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন– আমার মৃত্যুর পর তুই আমার লাশ দেখতে পারবি না, আমার জনাযায় শরীক হতে পারবি না ইত্যাদি। একপর্যায়ে তিনি আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছেন।

এখন জানার বিষয় হলো– এই পরিস্থিতিতে আমি কী করতে পারি এবং আমি কি পিতার অবাধ্য সন্তান বলে গণ্য হবো?

(খ) শরীয়তে আমীরের এতায়াত দ্বারা কোন আমীরকে বুঝানো হয়েছে? আমীরকে না মানলে যে ধমকির কথা এসেছে তা কি আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

(গ) শরীয়তে মুসলমানদেরকে জামা'আতের সঙ্গে থাকতে বলা হয়েছে। এখানে জামা'আত বলতে কোন জামা'আত উদ্দেশ্য?

উত্তর : (ক) শরীয়তবিরোধী কোনো কাজে কারো এতায়াত তথা আনুগত্য করা জায়েয নেই, তা সে যেই হোক না কেন। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী আপনার জন্য পিতার আনুগত্য করে সা'দ সাহেবের অনুসারী হওয়া জায়েয হবে না। কারণ, আপনার পিতা আপনাকে এমন ব্যক্তির অনুসরণ করতে বাধ্য করছেন, যার চিন্তা-চেতনা কথা-বার্তা ও বক্তব্য শরীয়তের বিরোধী এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পরিপন্থী। তাই এ অবস্থায় পিতার কথা না মানার কারণে আপনি অবাধ্য সন্তান বিবেচিত হবেন না। তবে তাঁর সঙ্গে কোনো ধরনের বেয়াদবীমূলক আচরণও করা যাবে না। কারণ, শরীয়তে পিতা-মাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং যথাসম্ভব তাঁদের সেবা-যত্ন করার যথেষ্ট

গুরুত্ব রয়েছে; চাই তাঁরা যেমনই হোন না কেন। সুতরাং বিনয়ের সাথে তাঁর সঙ্গে কথা-বার্তা বলা এবং তাঁকে বুঝানোর চেষ্টা ও দু'আ করাই আপনার দায়িত্ব। (সূরা লুকমান- ১৫, সূরা মারয়াম- ৪২, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৭০৭, সহীহ বুখারী; হা.নং ২৬২০, তাফসীরে ইবনে কাসীর ৬/৩৫৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৪৮)

(খ) ইসলামী শরীয়তে আমীরের এতায়াত ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে, এর দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্রের ন্যায়পরায়ণ শাসক বা শাসক কর্তৃক নিযুক্ত ন্যায়পরায়ণ প্রতিনিধির আনুগত্যকে বুঝানো হয়েছে। আমীরকে না মানলে যে ধমকির কথা হাদীসে এসেছে তা মূলত এক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এছাড়া নিজেদের আপোসে পরামর্শক্রমে নির্ধারিত আমীর যদি দীনদার পরহেযগার হয়, তার এতায়াত ওয়াজিব নয়; বরং মুস্তাহাব। সুতরাং ইসলামী শরীয়তে আমীরের নির্দেশ মানাকে আবশ্যক সাব্যস্ত করা এবং আমীরের আনুগত্য থেকে বের হওয়ার ধমকি সম্বলিত যে বর্ণনা এসেছে, তাবলীগের আমীরের এতায়াত মৌলিকভাবে সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এগুলো ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়ক বা তার প্রতিনিধির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

মুফতী শফী রহ. বলেন, কোনো সংগঠন বা সংঘের নেতৃত্ব (কুরআন-সুন্নাহয় ব্যবহৃত) পারিভাষিক 'ইমারত' নয়। কাজেই এ ধরনের ইমারতের তত্ত্বাবধানে যে কোনো ধরনের দীনী এবং দুনিয়াবী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা কিংবা তাদের নির্দেশনাকে দীনী ও দুনিয়াবী সকল বিষয়ে প্রযোজ্য ও অবশ্যপালনীয় মনে করা যাবে না।

তাবলীগের আমীর হোক বা অন্য কোনো দীনী সংগঠনের আমীর হোক, তাদের ইমারতের বিষয়টি শরীয়তের অন্য দলীলের অধীন। তা হলো, যখন কিছু মুসলমান এক জায়গায় একত্র হয়, তখন হাদীসের নির্দেশনা হলো, নিজেদের সুবিধার্থে একজনকে আমীর নিযুক্ত করে নেয়া। হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. এবং আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সফর অবস্থায় যখন সফরসঙ্গী তিনজন হয়, তখন যেন একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়া হয়।

আমীর বানানোর নির্দেশ এজন্যে দেয়া হয়েছে, যেন ঝগড়া ও মতবিরোধ নিরসন করা সহজ হয়। এখানে আমীর বানানোর নির্দেশ 'ইস্তিহবাব' বা উত্তম বোঝানোর জন্য; ওয়াজিব বা বাধ্যকরণের জন্য নয়। আমীর বানানো মুস্তাহাব হলেও যখন কিছু লোক মিলে চুক্তিবদ্ধ হয়ে একজনকে আমীর বানানো হয়, তখন তাদের জন্য নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তাকে মানা জরুরী হয়ে যায় অন্য দলীলের কারণে। তা হলো, মুসলমানগণ যখন পরস্পরে একটি বিষয়ের উপর চুক্তিবদ্ধ হয়, তখন তা তাদের নিজেদের মধ্যে রক্ষা করা জরুরী। আর আমীর নিযুক্ত হওয়া এবং তার এতায়াত মুস্তাহাব হওয়াটা শরীয়তমতে যোগ্য হওয়া এবং শরীয়ত পরিপন্থী কাজের নির্দেশ প্রদান না করার শর্তের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

অথচ মাওলানা সা'দ সাহেব তার আদর্শগত ও চিন্তাগত বিভ্রান্তির কারণে এ জাতীয় মুস্তাহাব পর্যায়ের আমীর হওয়ারও যোগ্য নন। কজেই তাকে আমীর মান্য করা ওয়াজিব দূরের কথা মুস্তাহাবও নয়; বরং নাজায়েয। (সূরা বাকারা- ৫৯, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৭০৭, আহকামুল কুরআন ৩/২৯৮, মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক; হা.নং ১৫৬০৯, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ২৬০৫, জাওয়াহিরুল ফিকহ ৫/৪৭৭)

(গ) হাদীস শরীফে যে জামা'আতের সাথে সঙ্গবদ্ধ হয়ে থাকতে বলা হয়েছে, এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। যার সারমর্ম হলো, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ। অর্থাৎ যারা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের আদর্শের উপর বহাল থাকবে। এমনকি এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'এরা হচ্ছে যারা আমার এবং আমার সাহাবীদের আদর্শের উপর থাকবে'। (সূরা আলে ইমরান- ১০৩, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৬৪১, আল-ই'তিসাম লিশ-শাতিবী ১/৪৬২, শরহু আকীদাতি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ; পৃষ্ঠা ২৫৯, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৮/৪০৩)

মুহাম্মদ এনামুল হক
কল্যাণপুর, ঢাকা

৩৯৪ প্রশ্ন : (ক) অমুসলিম ব্যক্তিকে বাসা ভাড়া দেয়া ও তার সঙ্গে হাদিয়ার আদান প্রদান করার বিধান কী?

(খ) অবসর সময়ে বিনোদনের উদ্দেশ্যে মোবাইল বা কম্পিউটারে গেমস খেলার শরয়ী বিধান কী?

(গ) এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলেছে, তুমি যদি তোমার বাপের বাড়ি যাও, তাহলে তুমি তালাক। অতঃপর স্ত্রী নিজ ইচ্ছায় বাবার বাড়ি যায়নি; বরং তার পিতা পুলিশ পাঠিয়ে জোরপূর্বক তাকে নিয়ে যায়। জানার বিষয় হলো, এভাবে জোরপূর্বক নিয়ে যাওয়ার কারণে তালাক হয়েছে কি না?

উত্তর : (ক) শরীয়তের বিধান মতে মুসলমানদের জন্য পারস্পরিক যেসব লেনদেন বৈধ, অমুসলিমদের সাথেও সেসব লেনদেন বৈধ। সুতরাং প্রতিবেশীদের দীনী বিষয় ক্ষতি না হওয়ার শর্তে অমুসলিম ব্যক্তিকে বাসা ভাড়া দেয়া জায়েয আছে। এ বাসার ভিতরে অবস্থান করে সে আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হলে তার দায়ভার মুসলমান মালিকের উপর বর্তাবে না।

আর অমুসলিম ব্যক্তিকে ইসলামের দিকে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে হাদিয়ার আদান-প্রদান জায়েয আছে। তবে সর্বাবস্থায় তাদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব স্থাপন করা সম্পূর্ণ নিষেধ। তাই তাদের প্রতি শুধু মহব্বতের কারণে হাদিয়ার আদান প্রদান করা জায়েয হবে না। (সূরা মুমতাহিনা- ৮, সহীহ বুখারী; হা.নং ২৬১৬, ২৬১৯, ই'লাউস সুনান ১৬/১৫২, আল-মাবসূত ১৫/১৩৪, ফাতাওয়া শামী ৬/৩৯২, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৫/১৩৩, কিফায়াতুল মুফতী ৯/৩১৮, ইমদাদুল আহকাম ৪/৩৯২)

(খ) কোনো মুসলমানের জন্য অযথা সময় নষ্ট করা, অনর্থক কাজে লিপ্ত হওয়া বৈধ নয়। মোবাইলে বা কম্পিউটারে গেমস খেলার দ্বারা অনর্থক কাজে সময় নষ্ট করা হয়; নামায, রোযা ও দীনের অন্যান্য কাজে অলসতা চলে আসে। তাছাড়া বর্তমানে অনেক গেমসের মধ্যে বেগানা নারীর ছবি থাকে, মিউজিক বাজতে থাকে। অনেক গেমস খেলতে হলে অর্থের অপচয় করতে হয়, জুয়া খেলতে হয় কিংবা জুয়া খেলার তরীকা শেখানো হয়। যেসব গেমস খেলতে গিয়ে এসব কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেগুলো খেলা নাজায়েয ও গুনাহের কাজ। আর বর্তমানে এমন গেমসও চালু হয়েছে, যা খেলতে হলে কৃত্রিম মূর্তির সামনে সিজদা করতে হয়, বাইতুল্লাহর উপর আঘাত করতে হয়। এসব গেমস খেলায় লিপ্ত হলে ঈমানহারা হওয়ার সমূহআশঙ্কা আছে। তাই এগুলো থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। বিনোদন বা আনন্দের জন্য কোনো গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়া হারাম। (সূরা লুকমান-৬, আল-বাহরুর রায়িক ৮/২৩৫, ফাতাওয়া

শামী ৬/৩৯৫, আল-মাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা আল-কুওয়াইতিয়্যা ৩৫/২৬৮, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৭/৩৬৬)

(গ) যদি তালাক কোনো কাজের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়, তাহলে ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে ঐ কাজ করার সঙ্গেসঙ্গেই তালাক পতিত হয়ে যায়। প্রশ্নের বর্ণনা সঠিক হলে ঐ ব্যক্তির স্ত্রীর উপর এক তালাকে রজঈ পতিত হয়েছে। এখন ইদ্দত পালন করার পর উক্ত স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ বসতে পারবে। ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার আগে তাকে শরঈ পদ্ধতিতে রাজ'আত তথা পুনরায় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে।

উল্লেখ্য, ইদ্দত হলো তালাক পতিত হওয়ার পর স্ত্রী হায়েযা হলে পূর্ণ তিন হায়েয আর গর্ভবতী হলে গর্ভপ্রসব, অন্যথায় তিনমাস সময়কাল অতিক্রান্ত হওয়া। (আল-ইনায়া শরহু হিদায়া ৫/৬৫, ১০৮, আল-মুহীতুল বুরহানী ফিল-ফিকহিন নু'মানী ৪/৩১৮, আল-বিনায়া শরহুল হিদায়া ৬/১১৮, দুরারুল হুক্কাম শরহু গুরারিল আহকাম ২/৫৪, ফাতাওয়া শামী ৩/৩৬৯, আহসানুল ফাতাওয়া ৫/১৮১)

মুহাম্মাদ হাসান
ঢাকা

৩৯৫ প্রশ্ন : (ক) আজকাল বিভিন্ন নামী-দামী রেস্টুরেন্টে বুফে সিস্টেমে মানুষ খাবার খেয়ে থাকে। সেখানে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পরিশোধ করে যে কোন খাবারের আইটেম যতো ইচ্ছা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। যেমন, কোন ব্যক্তি ৫০০ টাকা দিয়ে কোন নামী-দামী রেস্টুরেন্টের বুফে টিকেট কিনলো ডিনার করার জন্য। এখন সে খাবারের ১৫/২০ পদ থেকে তার পছন্দ অনুযায়ী যে কোন পদ থেকে যতো ইচ্ছা নিয়ে খেতে পারবে এক বেলার জন্য। জানার বিষয় হলো, উক্ত পদ্ধতিটি সঠিক কি না?

(খ) বেহেশতী যেওর কিতাবে একটি মাসআলা রয়েছে– 'ধান, চাউল, তেল, ঘি ইত্যাদি যেসব জিনিস ওজন করে বা মেপে ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তার মূল্য ঠিক করে ক্রয় করার পর যদি তা ক্রেতার বা ক্রেতা যে লোক (উকিল) পাঠিয়েছে তার সামনে ওজন না করে দিয়ে থাকে তাহলে বাড়ি গিয়ে ঐ জিনিস পুনরায় না মেপে খাওয়া, বিক্রয় করা বা ব্যবহার করা দুরস্ত হবে না। না মেপে বিক্রি করলে বাইয়ে ফাসেদ হবে। পরে যদি মেপেও নেয় তবুও তা দুরস্ত হবে না'।

এখন আমাদের সমাজের প্রচলিত চিত্র হলো আমরা বাজার করার সময় মুদি দোকানদারকে লিস্ট ধরিয়ে দেই। সে লিস্ট অনুযায়ী দোকানদারের কর্মচারী বিভিন্ন জিনিসপত্র পরিমাণ অনুযায়ী পরিমাপ করে প্যাকেট করতে থাকে। যেমন, পেঁয়াজ ৫ কেজি, চাল ৩ কেজি ইত্যাদি। এই সুযোগে ক্রেতা তার কাচাবাজার, মাছ-গোশতের বাজার সেরে আসে। এতে করে ক্রেতার সময়ের সাশ্রয় হয়। কিন্তু ক্রেতার সামনে তো উক্ত পণ্য মাপা হলো না। এখন ক্রেতা পরবর্তীতে মুদি দোকানে এসে মূল্য পরিশোধ করে তার পূর্বের দেয়া লিস্ট অনুযায়ী ওজনকৃত মালামাল নিয়ে যায়।

প্রথমত আমার জানার বিষয় হলো, যদি দোকানদার আমানতদার, সৎ ও বিশ্বস্ত বলে সমাজে পরিচিত হয় এবং সে প্রকৃতপক্ষেই ক্রেতার কাছে ন্যায্য মূল্যে, সঠিক ওজনে, গুণগতমানসম্পন্ন পণ্য বিক্রি করে তাহলেও কি এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়কে বাইয়ে ফাসেদ বলা হবে?

দ্বিতীয়ত যদি বাইয়ে ফাসেদ হয়ে থাকে তাহলে দীর্ঘদিন ধরে যে এভাবে ক্রয়-বিক্রয় চলে আসছে এর কাফফারা কিভাবে হবে? এতোদিন কি তাহলে ক্রেতাদের হারাম খাওয়ার গুনাহ হবে?

তৃতীয়ত এরূপ ক্ষেত্রে শরীয়তসম্মত বিকল্প পদ্ধতিটি বলে দিলে উপকৃত হবো।

উত্তর : (ক) বর্তমানে বুফে সিস্টেমে খাওয়ার যে প্রচলন শুরু হয়েছে, সেখানে মূলত খাবারের মূল্য নির্ধারিত থাকে। যদিও পরিমাণ ও ধরণ নির্ধারিত থাকে না। তা সত্ত্বেও বর্তমানে এ পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন হওয়ায় এবং ঝগড়া সৃষ্টির আশঙ্কা না থাকায় শরীয়ত মতে এই পদ্ধতি জায়েয হওয়ার অবকাশ রয়েছে। (ফিকহুল বুয়ূ' ১/৩৮৮)

(খ) যদি বিক্রেতার ওপর ক্রেতার আস্থা থাকে এবং ঝগড়া সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে তাহলে ক্রেতা বা তার উকিলের সামনে মাপা অথবা ক্রেতার ঘরে এনে মাপা জরুরী নয়। তবে ক্রেতা তার উকিলের সামনে মাপা অথবা ক্রেতার ঘরে এনে মাপা তখনই জরুরী যখন বিক্রেতার উপর ক্রেতার আস্থা না থাকে এবং ঝগড়া সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে। আর বেহেশতী যেওরের মাসআলা দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য।

সুতরাং বর্তমানে যে সকল জিনিসপত্রে ক্রেতার অনুপস্থিতিতেও ওজন করে বেচাকেনার ব্যাপক প্রচলন হয়ে গেছে, সেগুলোতে ক্রেতার অনুপস্থিতিতে ওজন করার ক্ষেত্রে ক্রেতার সন্তুষ্টি থাকায় এবং কোন ঝগড়ার আশঙ্কা না থাকায় তা বাইয়ে ফাসেদ বলে বিবেচিত হবে না। (ফয়যুল বারী ৩/২২০, আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর ১/১৭৩, ফাতাওয়া কাসিমিয়্যা ১৯/২৭৮)

মুহাম্মাদ হাসান
ঢাকা

৩৯৬ প্রশ্ন : (ক) কোন ব্যক্তি ওয়ারিস হিসেবে তার মা-বাবার সম্পত্তির একাংশ প্রাপ্ত হলো। কিন্তু তার এ ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জানা আছে যে, তার বাবার উপার্জন পুরোটা হালাল ছিলো না। তার পিতা সুদ-ঘুষ গ্রহণ করতো এবং কর্জের বিনিময়ে সুবিধা গ্রহণ করতো। কিন্তু তার বাবার উপার্জনের কতটুকু অংশ হালাল ও কতটুকু হারাম তা তার জানা নেই। এখন সে কিভাবে ওয়ারিস হিসেবে প্রাপ্ত সম্পত্তি থেকে হারামকে পৃথক করবে?

(খ) দাদার আয়ের কিছু অংশ হারাম ছিল। আবার এদিকে ফুফুদেরকে জমি কম দেয়া হয়েছে। প্রশ্ন হলো, এরূপ সম্পত্তি যদি পিতার মাধ্যমে নাতির নিকট পৌঁছে তাহলে তার করণীয় কী?

(গ) যদি দাদার বা পরদাদার সম্পদের হারাম অংশ বংশ পরম্পরায় নাতি বা পরনাতির নিকট এসে থাকে যার কিছু হারাম। আর এ হারাম সম্পদের ব্যাপারে নাতি বা পরনাতির ওয়াকিফহাল হওয়া একেবারেই অসম্ভব। তাহলে কি উক্ত হারাম মিশ্রিত সম্পদ ভোগ করা তার জন্য জায়েয হবে?

উত্তর : (ক) বাবা-মার সম্পত্তি থেকে ওয়ারিসসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে যদি নিশ্চিতভাবে হারাম মালের মিশ্রণ থাকে তাহলে উক্ত সম্পদ থেকে হারাম মালের দায় থেকে মুক্ত না হয়ে তা ব্যবহার করা জায়েয হবে না। তবে হারাম ও হালালের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করা বা পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব না হলে অনুমান করে যে পরিমাণ অংশ হারাম হওয়ার আশঙ্কা আছে সে পরিমাণ সম্পত্তি পৃথক করে মালিক জানা থাকলে সংশ্লিষ্ট মালিককে ফেরত দিতে হবে। মালিক জানা না থাকলে যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে অথবা যে কোন সওয়াবের কাজে প্রকৃত মালিককে সওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে বা দায়মুক্তির নিয়তে সে বস্তু বা তার মূল্য সদকা করতে হবে। সদকা না করে নিজে উক্ত সম্পত্তি ব্যবহার করা জায়েয হবে না। একসঙ্গে সম্ভব না হলে পর্যায়ক্রমে সদকা করতে থাকবে। সেই সাথে আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনাও চালু রাখবে।

(খ) দাদার সম্পত্তি থেকে পিতার মাধ্যমে নাতি যে অংশের মালিক হয়েছে তাতে প্রথমে তার ভাগে শরীয়তকর্তৃক নির্ধারিত ফুফুদের প্রাপ্য অংশ তাদের কিংবা তাদের ওয়ারিসদের প্রদান করতে হবে। এরপর হারাম অংশের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরের পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

(গ) দাদা বা পরদাদার সম্পদের হারাম অংশ বংশ পরম্পরায় নাতি বা পরনাতির নিকট এসে থাকলে (ক) প্রশ্নের জবাবে উল্লেখিত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। (সূরা বাকারা- ১৮৮, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ৩১০৪১, ফাতাওয়া শামী ৫/৯৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৪৯, মাজমাউল আনহুর ২/৫২৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৩০/১৭৪)

হাবীবুর রহমান
ধুনট, বগুড়া

৩৯৭ প্রশ্ন : (ক) আমার বাড়ি বগুড়া। বিবাহ করেছি সিরাজগঞ্জে। ঢাকায় থেকে লেখাপড়া করি। সিরাজগঞ্জ থেকে বগুড়া সফরের দূরত্ব নয়। এখন আমি ঢাকা থেকে বাড়ি যাওয়ার পথে যদি সিরাজগঞ্জে শ্বশুরালয়ে যাই, তাহলে কসর করব নাকি পুরো নামায পড়বো? অথবা যদি বাড়ি থেকে ঢাকায় যাওয়ার পথে শ্বশুর বাড়ি যাই তখন কি করব? উল্লেখ্য, আমি ছাত্র হওয়ার কারণে বাড়িতে ১৫ দিনের কম থাকার নিয়তে যাই।

(খ) আমরা অনেক সময় ঢাকায় যাতায়াতের জন্য উবার অ্যাপ-এর মাধ্যমে গাড়ি ভাড়া করে থাকি। যখন এক স্থান হতে অন্য স্থানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে গাড়ি ভাড়া করতে অ্যাপ চালু করা হয়, তখন একটি ভাড়া শো করে। এক্ষেত্রে অনেক সময় নির্ধারিত স্থানে পৌঁছার পর পূর্বের ভাড়াই আসে, আবার অনেক সময় রাস্তায় জ্যাম ইত্যাদির কারণে বেশি ভাড়া আসে, যে কারণে যাত্রীর সঙ্গে চালকের ঝগড়া হয়। এর দ্বারা বুঝে আসে যে, চুক্তির সময় যে ভাড়া শো করেছে সেটা নির্ধারিত না। অথচ ইজারার জন্য শর্ত হলো, চুক্তির সময় ভাড়া নির্ধারণ করা।

এখন জানার বিষয় হলো, এভাবে উবারে গাড়ি ভাড়া করে যাতায়াত করা শরীয়ত সমর্থিত কি না? জ্যামের কারণে যে অতিরিক্ত ভাড়া আসে চালকের জন্য তা নেয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : (ক) আপনি ঢাকা থেকে বগুড়া আসা-যাওয়ার পথে শ্বশুরালয়ে ১৫ দিনের কম সময়ের জন্য গেলে মুসাফির গণ্য হবেন। (ফাতাওয়া শামী ২/১৩১, ইমদাদুল আহকাম ১/৬৯৩, ৭২৩)

(খ) উবারের মাধ্যমে গাড়ি ভাড়া করার ক্ষেত্রে চুক্তি সংঘটিত হওয়ার সময় তার দূরত্ব, স্থান ও প্রাথমিক মূল্যসহ ভাড়া নির্ধারিত হওয়ার কারণে উবার ব্যবহার করতে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন অসুবিধা নেই। আর জ্যামের কারণে ভাড়া বৃদ্ধি হওয়া; এটা যদি উবারের নিয়মানুযায়ী হয় এবং এতে চালকের কোন কারসাজি বা নেটের গোলযোগ না থাকে, তাহলে সে বর্ধিত ভাড়া গ্রাহক দিতে বাধ্য থাকবে এবং চালকের জন্যও নেয়া জায়েয হবে। আর যদি বর্ধিত ভাড়ায় চালকের কারসাজি অথবা তাতে নেটের কোন গোলযোগে ভাড়া বেড়ে যায়, তাহলে এ অতিরিক্ত ভাড়া গ্রহণ করা চালকের জন্য জায়েয হবে না। (ফাতাওয়া শামী ৪/২২, উমদাতুর রি'আয়া ৯/৬৪)

আব্দুস সালাম
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

৩৯৮ প্রশ্ন : (ক) কেউ যদি শুধু একথা বলে 'আমি যদি এ কাজটি করি, তবে আমার উপর কাফফারা হবে।' অতঃপর ঐ কাজটি করলে তার বিধান কী হবে?

(খ) আমার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ব্যাংকার। মাঝে মাঝে সে এমন অনেক কিছু হাদিয়া দেয়, যা নিত্য প্রয়োজনীয়। হাদিয়া দেয়ার পর সে ঐ জিনিস ব্যবহার করেছি কি না জিজ্ঞাসাও করে। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কী?

(গ) ঈদের নামাযে মাসবূক ব্যক্তি বাকি নামায কিভাবে আদায় করবে?

(ঘ) চেয়ারে বসে নামায আদায়ের সময় মুক্তাদীর পা ইমামের পা থেকে আগে বেড়ে গেলে নামায হবে কি না? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : (ক) প্রশ্নোক্ত বর্ণনা মতে 'আমি যদি এ কাজ করি, তবে আমার উপর কাফফারা হবে' কথাটি বলার কারণে (ইয়ামীন) সংঘটিত হয়েছিলো এবং পরবর্তীতে কাজটি করায় তাকে কাফফারা আদায় করতে হবে। অর্থাৎ দশজন গরীব-মিসকীনকে দুই বেলা খাওয়াবে বা মধ্যম ধরনের এক জোড়া কাপড় দিবে। এগুলোর সামর্থ্য না থাকলে লাগাতার তিনদিন রোযা রাখবে। (ফাতাওয়া শামী ৩/৭০২, ৭২৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২/৫৭, আল-মাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা আল-কুওয়াইতিয়্যা ৭/৩০০)

(খ) সুদী ব্যাংকে চাকরিজীবির বেতন হালাল নয়। অতএব কোনো ব্যাংকারের ব্যাপারে যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, তার বিকল্প কোনো হালাল আয়ের উৎস নেই বা তার অধিকাংশ আয় ব্যাংকের বেতন বাবদ অর্জিত কিংবা তার দেয়া হাদিয়াটি হারাম উপার্জনের টাকা থেকে দিয়েছে, তবে তা গ্রহণ করার কোনো অবকাশ নেই। বাধ্য হয়ে কখনো গ্রহণ করতে হলে তা ব্যবহার না করে কোনো গরীবকে সওয়াবের নিয়ত ব্যতীত শুধু দায়মুক্তির নিয়তে দান করে দিবে। আর ব্যবহার করতে বাধ্য হলে অনুমান করে তার বাজার মূল্য দান করে দিবে।

পক্ষান্তরে যদি নিশ্চিত জানা যায় যে, সে হাদিয়াটি হালাল উপার্জন থেকে দিয়েছে অথবা তার অধিকাংশ আয় হালাল উৎস থেকে অর্জিত, তবে তা গ্রহণ করতে অসুবিধা নেই। (ফাতাওয়া শামী ৬/৩৮৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৪২০, আল-মাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা আল-কুওয়াইতিয়্যা ৩৪/২৪৫)

(গ) ঈদের নামাযে মাসবূক যদি প্রথম রাকা'আতে অতিরিক্ত তাকবীরের পরে শরীক হয়, তবে ইমামের কিরাআত পড়া অবস্থায় সে তাকবীরগুলো দিবে। আর যদি রুকু অবস্থায় শরীক হয়, তবে তাকবীরে তাহরীমা বলার পরে সম্ভব হলে তাকবীরগুলো বলে রুকুতে যাবে। অন্যথায় রুকুতে থাকাবস্থায় হাত উঠানো ব্যতীত তাকবীর বলবে। আর প্রথম রাকা'আত না পেলে পরে প্রথম রাকা'আত আদায়কালে আগে কিরাআত পড়ে রুকুর পূর্বে তাকবীর দিবে। তবে যদি আগে তাকবীর দিয়ে পরে কিরাআত পড়ে, তবুও আদায় হয়ে যাবে। (ফাতাওয়া শামী ২/১৭৩, আল-বাহরুর রায়িক ২/১৭৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৬৬)

(ঘ) চেয়ারে বা ফ্লোরে বসে নামায আদায়কারীর পা ইমামের পা থেকে আগে বেড়ে গেলে তার নামাযের কোনো ক্ষতি হবে না। তবে তার নিতম্ব ইমামের পা থেকে আগে বেড়ে গেলে নামায সহীহ হবে না। (আল-মাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা আল-কুওয়াইতিয়্যা ৬/২১)

কিশোর প্রতিভা

বিশ্ব ইজতিমার স্মৃতি

৮ জানুয়ারি ২০২০। বুধবার রাত ১০টা। হাড়কাঁপানো কনকনে শীত। বিকট শব্দে চালু হল বাসের ইঞ্জিন। ভেতরে প্রায় পঞ্চাশজন তালিবে ইলম। গন্তব্য বিশ্ব ইজতিমার ময়দান। যানজট পেরিয়ে দীর্ঘ চার ঘণ্টা পর ময়দানে পৌঁছলাম। উঁচু সড়কের উপর থেকে শেষরাতের আলো ঝলমলে ময়দান দৃষ্টিগোচর হলো। অন্যরকম আবেগ আর ভালোবাসায় উথলে উঠলো মন। হ্যাঁ, অনুপম ভ্রাতৃত্ব ও পরম সৌহার্দের এই ময়দানই বছরখানেক আগে কিছু বে-বুঝ লোকের হাতে উলামা-তালাবার রক্তে রঞ্জিত হয়েছিলো! থাক সে কথা; আল্লাহ সবাইকে সহীহ বুঝ দান করুন।

দেখতে দেখতে এক দিন পর কাঙ্ক্ষিত শুক্রবার এসে গেলো। এদিন বাদ ফজর আমবয়ানের মাধ্যমে ইজতিমার নিয়মতান্ত্রিক কার্যক্রম শুরু হলো। আহা! সে কি দরদমাখা মর্মস্পর্শী বয়ান! বাস্তবমুখী সে বয়ান মনোযোগ দিয়ে শুনলে হৃদয়ের বন্ধদুয়ার খুলে যায়। শয়তানের জালে ফেঁসে যাওয়া জীবন নতুন করে শুরু করার ইচ্ছা জাগে।

বিশ্ব ইজতিমায় বয়ান ছাড়াও ভালো লাগার মতো অনেক কিছু আছে। উদাহরণত লক্ষ লক্ষ মুসল্লীর এক জামা'আতে নামায আদায়। সর্বদা যিকিরে ফিকিরে চলাচল। যার যার ডানে হাঁটাচলা। সকলকে ভাই বা হযরত বলে মহব্বতপূর্ণ সম্বোধন। একই পরিভাষার ব্যবহার যেমন– চিল্লা, গাশত, তা'লীম, বয়ান, তাশকীল, এ'লান, মেহনত, মুবাল্লিগ, আমীর, রাহবার, যিম্মাদার, জামা'আত, সাথী, মামূর, মুতাকাল্লিম, খুসূসী, উমূমী, শূরা, মশওয়ারা ইত্যাদি। ভালোবাসার এই ময়দানে আরব-অনারব, ধনী-গরীব, আশরাফ-আতরাফ সবাই সমান। এখানে কোটিপতিও চাটাইয়ের উপর রিকশাচালকের পাশে বসে বয়ান শোনে, রাত্রি যাপন করে এবং একই দস্তরখানে একই পাত্রে খানা খায়।

তিনদিনের এই মুবারক ইজতিমা থেকে আমি যা পেয়েছি তার সারসংক্ষেপ হলো– সত্যিকার মুমিন হওয়ার মৌলিক দিকনির্দেশনা, গুনাহমুক্ত ও সুন্নাহসম্মত জীবন যাপনের অনুপ্রেরণা, সার্বক্ষণিক আল্লাহর স্মরণ ও ইখলাসপূর্ণ আমলের মযবুত চেতনা।

নফস ও শয়তানের ধোঁকায় এর সবগুলো হয়তো জীবনে ধারণ করতে পারছি না; কিন্তু আল্লাহওয়ালাদের বয়ান শোনে এতোটুকু উপলব্ধ হয়েছে যে, দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী জীবন শুধুই মরীচিকা। এখানকার হাজারো সম্পর্ক ও কর্মব্যস্ততা চক্ষু বন্ধ হওয়ার সাথেসাথেই শেষ হয়ে যাবে। কাজেই সেই দিনের জন্য মৃত্যুর আগে আগেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে, যেদিন এক পরাক্রমশালী মহাবিচারকের সামনে হিসাব দিতে হবে মৃত্যুপূর্ব জীবনের যাবতীয় কাজ-কর্মের।

১২ তারিখ রবিবার সকালে হেদায়াতী বয়ানের পর শুরু হলো আখেরী মুনাজাত। সে কি কান্নাকাটি আর আকুল আহাজারি! লক্ষ লক্ষ চোখ থেকে অঝোরে পানি ঝরছে। আকাশ-বাতাস গুঞ্জরিত সেই কান্নাকাটির আওয়াজে আমার ভিতর থেকেও হুহু করে কান্না বেরিয়ে আসলো। যে ময়দানে লক্ষ লক্ষ কপাল একসঙ্গে সিজদায় যায়, লক্ষ লক্ষ হাত একসঙ্গে মালিকের দরবারে ফরিয়াদ জানায়, আশা করা যায় সে ময়দানের দু'আও বিফলে যেতে পারে না। এজন্য প্রাণখুলে সবার জন্য দু'আ করলাম।

রাব্বে কারীমের নিকট ফরিয়াদ! দীনের এই মুবারক ইজতিমা সহীহ নাহজে কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকুক। কোটি কোটি পথহারা খুঁজে পাক কাঙ্ক্ষিত মঞ্জিল।

মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ মানিকগঞ্জী
জামি'আ ইলয়াসিয়া ইসলামিয়া, ঢাকা

সোনালী শৈশব!

রাতের নিস্তব্ধতা ছাপিয়ে মোরগের ডাক যখন ভোর ডেকে আনতো, সারারাত সুবাস ছড়ানো শিউলি ফুলেরা তখন বড্ড ক্লান্ত। একটু ঝাঁঝালো সুবাস বলে শিউলির প্রতি আমাদের তেমন আকর্ষণ ছিল না। তবে বকুল ফুলের প্রতি আমাদের আগ্রহের শেষ ছিল না। আহা কী মিষ্টি, আহা কী মনমাতানিয়া সেই ঘ্রাণ!

শেষরাতে মাঝে-মধ্যে হালকা বৃষ্টি হতো। বৃষ্টিতে ভিজে চুপচুপে হয়ে থাকতো বকুলতলা। অসতর্ক হলেই পা-হড়কে আছাড় খাওয়ার আশঙ্কা! তবু ঘুম থেকে উঠে সবার আগে বকুলতলায় যাওয়া চাই! ঝরা বকুলের প্রাচুর্যে গাছতলার মাটি তখন সাদায় সয়লাব। একগাদা বকুল কুড়িয়ে সকালের স্নিগ্ধ বাতাস গায়ে মেখে ঘরে ফিরতাম।

শৈশবের স্মৃতিঘেরা সেই গ্রামীণ পরিবেশ কতই না সুন্দর ছিল! বাড়ির আঙিনাজুড়ে ছিল গাছপালার রাজ্য। গাছগুলোর মধ্যমণি ছিল একটা বরই গাছ। মাঝারিগোছের বরই গাছটির ডালপালা ছিল অনেক বিস্তৃত। আঙিনার একপাশে ছিল পুরনো পুকুর, কচুরিপানার ফাঁকে ফাঁকে শিংমাছ ঘাঁই মারতো। আরেক পাশে ছিল আমাদের খেলাধুলার জায়গা। বরইয়ের মৌসুমে গাছটা ফুলে-ফুলে ভরে উঠতো। ছোট-ছোট কুশি বরইগুলো ক্রমশ বড় হয়ে উঠতো। একসময় গাঢ় সবুজ রঙে দেখা দিতো আলতো হলুদ- ছোঁয়া। বুড়ো হওয়ার সময় এদের অভিমান যেন বাড়তে থাকতো; আহ্লাদে হয়ে উঠতো লাল টুকটুকে!

সকালের লাল সূর্যটা যখন আলোকরশ্মি ছড়িয়ে অনেকটা উপরে উঠে যেতো, তখন সেই বরই গাছতলায় আমাদের আসর বসতো। ধুতরার পাতাকে প্লেটের জায়গায় বসিয়ে ধুলোবালিকে আমরা ভাতের মর্যাদা দিতাম। ইটের কণাগুলো ছিল আমাদের গোশত-মাছ আর দুর্বাঘাসের কচিকচি ডগা ছিল সালুন-সবজি। সবকিছু নিয়ে সেই বরইগাছের মায়াবী ছায়ায় বসে আমরা খাওয়ার ভান করতাম। নিছক এই ভনিতায়ও আমাদের যে কতোটা আত্মপ্রসাদ লাভ হতো তা অকল্পনীয়!

আবার মাঝে-মাঝে কলাগাছের খোল-বাকল দিয়ে দোকান সাজিয়ে বসতাম! বরই গাছের পাশেই ছিল একটা পাকা করা বসার জায়গা। শরতের স্নিগ্ধ প্রকৃতিতে যখন আকাশজুড়ে সাদা মেঘের ভেলা ভেসে বেড়াতো এবং শরীরে শিহরণ জাগিয়ে বয়ে যেতো মিষ্টি বাতাস, আমি তখন সেখানে গিয়ে একাকী বসে থাকতাম।

বরই গাছটাকে আমি খুব ভালোবাসতাম। গোধুলিলগ্নে নীড়ে ফেরা পাখিদের আসর বসতো গাছটিতে। মনে হতো তারা আমার দাওয়াতী মেহমান! অনেকবার গাছটিতে চড়ার চেষ্টা করেছি, সফল হইনি; আমি যে শুধু লিচুগাছেই উঠতে জানি!

শীতের রাতে সেই আঙিনার মাঝখানে আগুন পোহানোর ব্যবস্থা করা হতো। আমরা সবাই দাদাজীকে ঘিরে বসতাম। দাদাজী আমাদেরকে গল্প শোনাতেন। চাঁদের আলো আর হালকা কুয়াশা আমাদের চারপাশটাকে মায়াময় করে রাখতো। আজ প্রিয় দাদাজীও নেই, গল্প বলারও মানুষ নেই। প্রিয় সেই বরই গাছের দক্ষিণ পাশেই দাদাজী শায়িত হয়েছেন চিরনিদ্রায়।

জীবনের নিষ্ঠুর বাস্তবতায় মধুময় শৈশবকে আমি ফেলে এসেছি কচুরিপানা ভর্তি পুকুরে, বিলের ধারে, বকুল আর বরই গাছতলায়। আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না শৈশবের ফেলে আসা স্বপ্নিল প্রভাত, সোনাঝরা রোদ্দুর আর ঘুড়ি ওড়ানো বিকাল। জীবন বয়ে যাচ্ছে, আমি বেড়ে উঠছি, কিন্তু শৈশবের সেই ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে হলে আমি যেন থমকে দাঁড়াই। স্বপ্নময়, সুখকর স্মৃতি আর আনন্দমুখর দিনগুলো মনের ক্যানভাসে বারবার বিষাদের ছবি আঁকে।

মাহমুদুল হাসান
জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা

এক সালামে মাদরাসা!

নামাযের জামা'আতের অপেক্ষায় বসে আছি। নূরানী চেহারা, শুভ্র দাড়ি, সুন্নাতী লেবাসে এক বয়ঃবৃদ্ধ এসে পাশে বসলেন। শ্রদ্ধামিশ্রিত সংকোচে একটু পেছনে সরে আসলাম। তিনি হাত ধরে সামনে টেনে নিলেন। বিনীত কণ্ঠে বললেন, বাবা! আমি আলেম বা বুযুর্গ নই; একজন সাধারণ মানুষ। ইতোমধ্যে জামা'আত শুরু হয়ে যাওয়ায় কথা শেষ না করেই নামাযে দাঁড়িয়ে গেলাম। নামাযের পর পুনরায় হাত ধরে বসালেন। গল্পচ্ছলে মেলে ধরলেন তার আলোকিত জীবনের দাস্তান! বললেন, শোনো বেটা! আমি ছিলাম সচিবালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। একবার অধীনস্ত এক কর্মচারীকে একটা কাজ দেই। সে কাজটা তো করেইনি; বরং জিজ্ঞাসা করায় উল্টো অভদ্র আচরণ করে। কষ্টে ক্ষোভে অফিস থেকে ফিরে এক জায়গায় একাকী বসে ছিলাম। মনটা ছিল বড়ই বিষণ্ন। এমন সময় তোমাদের কওমী মাদরাসার প্রথম ক্লাসে পড়ুয়া একটি ছেলে এসে আমাকে সালাম দিলো। সালামের বাংলা অর্থ আমার জানা ছিলো। সেই বিষণ্ন সময়ে তার ঐ সালাম আমার হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করলো। বারবার মনে হচ্ছিল মসজিদে যাই; হয়তো কষ্টটা লাঘব হবে এবং অন্তরে স্থিরতা ফিরে আসবে। বাসায় গিয়ে পোশাক পরিবর্তন করে পাঞ্জাবী-পায়জামা পরে নিলাম। মসজিদের গিয়ে মাগরিবের নামায আদায় করলাম। নামাযের পর তাবলীগওয়ালাদের বয়ান হলো– সেখানেও শরীক হলাম। অভূতপূর্ব এক অনাবিল প্রশান্তি অনুভব হতে লাগলো। তাশকীলের সময় অনেকের সাথে আমিও তিনদিনে যাওয়ার নিয়ত করলাম। নির্ধারিত দিনে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় চলে গেলাম। এভাবেই একটি সালামের উসীলায় আমার জীবনে পরিবর্তন আসলো। আমি হারানো পথ খুঁজে পেলাম। এখন আমার ছেলেরা সচিবালয়ে চাকরি করে। তারাও মাশাআল্লাহ আল্লাহর রাস্তায় সময় লাগিয়েছে। তাদের সন্তানেরা অর্থাৎ আমার নাতি-পুতিরাও মাদরাসায় পড়ে। সেই মানবরূপী ফেরেশতার কচি কণ্ঠের সালামটি আমার কানে আজও প্রতিধ্বনিত হয়। সেই সালামের বরকতে আমি আজও প্রশান্তি অনুভব করি। আর দিলে দিলে তার শুকরিয়া আদায় করি। দু'আ করি যেখানেই থাকুক আল্লাহ তাকে ভালো রাখুন, সুখে রাখুন।

তিনি আরো বললেন, বাড়িতে আমি একটি কওমী মাদরাসা করেছি। মাদরাসাটি এখন কাফিয়া ক্লাস পর্যন্ত আছে। আশা আছে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত করবো। সেখানে ছোট ছোট অনেক বাচ্চা পড়ে। তাদেরকে দেখলে চক্ষু জুড়িয়ে যায়। অন্তরে সুকূন ও সাকীনা হাসিল হয়। তখন মনে মনে সেই মুহসিন তালিবে ইলমকে জাযাকাল্লাহ বলি।

অতঃপর চোখ মুছতে মুছতে বললেন, এভাবেই আমি এ পোশাকের বহনকারী হয়েছি। যদিও আমি এর যোগ্য নই; সুরত ধরেছি মাত্র। আল্লাহ যেন এই পোশাকওয়ালাদের সঙ্গে আমাকেও কবুল করে নেন।

আহমাদ বিন আলী
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

জীবনের পরিবর্তন

মায়ের কাছ থেকে শোনা একটি বিস্ময়কর ঘটনা। আমাদের বাড়ির পাশে ছিলো এক দম্পতি। বহু বছর যাবৎ তাদের সন্তানাদি হচ্ছিল না। আল্লাহর মেহেরবানীতে সাতবছর পর তাদের একটি পুত্র সন্তান হলো। পিতামাতা নিয়ত করলেন, তাদের কলিজার টুকরোটিকে মাদরাসায় পড়াবেন, কুরআনের হাফেয ও আলেম বানাবেন।

সন্তানের বয়স দুই বছর হতে না হতেই পিতার মৃত্যু হয়ে গেলো। মা বৈধব্যের আগুন বুকে চাপা দিয়ে হাসিমুখে পুত্রধনকে লালন-পালন করেন। ছেলের বয়স যখন সাত বছর হলো, মা তাকে হাফেয বানানোর জন্য মাদরাসায় পাঠালেন। মায়ের বুক ভরা আশা, ছেলের মুখ থেকে এক খতম কুরআন শুনবেন এবং কিয়ামতের দিন নূরের মুকুট পরিধান করবেন। কিন্তু ছেলেটি যেন দুষ্টুমি ছাড়া আর কিছুই বুঝতো না। শিক্ষকের সামান্য শাসনেই সে মাদরাসা থেকে পালিয়ে আসতো আর মা ছেলেকে বুঝিয়ে শিক্ষককে মানিয়ে আবার মাদরাসায় দিয়ে আসতেন। কিন্তু ছেলেটি একসময় মাত্রা ছাড়িয়ে গেলো। মা অধৈর্য হয়ে পড়লেন। ছেলেকে বললেন, তুমি যদি আর একবার মাদরাসা থেকে পালিয়ে আসো, তাহলে বাড়িতে ফিরে আমার মরা মুখ দেখবে!

এমনটিই ঘটলো। ছেলেটি মাদরাসা থেকে পালিয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলো। পথিমধ্যে শুনতে পেলো তার মা বিষাক্ত সাপের দংশনে মারা গেছে!

সেদিন হতে ছেলেটির জীবনে বিরাট পরিবর্তন আসলো। সে আর এখন দুষ্টুমি করে না। মাদরাসা থেকেও পালিয়ে যায় না। মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করে। এভাবে নিয়মিত মেহনত করার কারণে ছেলেটি সাত মাসের মধ্যে কুরআনের হাফেয হয়ে গেলো। অতঃপর এক মাহফিলের রাতে তাকে হাফেয হওয়ার পাগড়ী পরানো হলো। পাগড়ী পরার পর সে এক অদ্ভুত আবদার জানালো। বললো, আমাকে আমার আম্মুর কবরের কাছে নিয়ে যাও; আম্মুকে আমি এক খতম কুরআন শুনাবো। লোকেরা তা-ই করলো। সে তার মায়ের কবরের পাশে বসে তিলাওয়াত করতে লাগলো এবং আশ্চর্য কাণ্ড! এই তিলাওয়াতরত অবস্থায়ই সে সাপের দংশনে ইন্তেকাল করলো। গ্রামের লোকেরা তাকে মসজিদের সন্নিকটে মায়ের কবরের পাশে দাফন করলো। এরপর একদিন মুআযযিন সাহেব ফজরের আযান দিতে উঠে শুনতে পেলো ছেলেটির কবর থেকে ভেসে আসছে কুরআন তিলাওয়াতের সুমধুর আওয়াজ!

হাসান আহমাদ
আশরাফুল মাদারিস, সতিঘাটা, যশোর

কিশোর বন্ধুরা! রাবেতার আগামী সংখ্যাটি হবে 'ফুযালা সম্মেলন সংখ্যা'। বুঝতেই পারছো, কতোটা সুন্দর ও আকর্ষণীয় হবে সংখ্যাটি। দেরি না করে তোমাদের কচি হাতের দারুণ দারুণ লেখাগুলো দ্রুত পাঠিয়ে দাও। কিভাবে লিখবে সে কথা নিশ্চয় মনে আছে। না থাকলে রাবেতার গত সংখ্যাটি আবার দেখে নাও। আর হ্যাঁ, সেরা তিন কিশোরের ৫ কপির পুরস্কার তো থাকছেই।

এ সংখ্যার সেরা তিন–

১. আব্দুল হামীদ মানিকগঞ্জী
২. মাহমূদুল হাসান
৩. আহমাদ বিন আলী

তোমরা রাবেতা কার্যালয় থেকে তোমাদের পুরস্কার গ্রহণ করো। আল্লাহ সবাইকে সুস্থ রাখুন, নিরাপদ রাখুন।